অনন্তের উপাসনা

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

অনন্তের উপাসনা
প্রথম প্রকাশ ১৩০৭

সাকার ও নিরাকার উপাসনা
প্রথম প্রকাশ ১৩০১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩২০

সম্মিলিত নূতন সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৭২

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
সম্পাদক, গ্রন্থপ্রকাশন সমিতি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস। ২১১।১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

বর্তমান গ্রন্থে স্বর্গীয় আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'অনন্তের উপাসনা' ও 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয় একত্র প্রকাশিত হইল। পূর্বে এই দুইটি রচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে নব্যভারত প্রেস হইতে 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'র যে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, বর্তমান সংস্করণে সেই পাঠই অবলম্বন করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগের ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের নব্যহিন্দুধর্ম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারিত নিরাকার উপাসনার, যে প্রতিকূল সমালোচনা করেন তাহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে মুখ্যতঃ নগেন্দ্রনাথ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান দুইটি নিবন্ধই উক্ত প্রতিপক্ষগণের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত। ভিন্ন সময়ে লিখিত বলিয়া রচনাদ্বয়ের মধ্যে কিছু কিছু পুনরুক্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান সংস্করণে স্থানে স্থানে কয়েকটি শব্দ বর্জন ব্যতীত নিবন্ধদ্বয়ের পাঠে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয় নাই। বর্তমান যুগে প্রধানতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীকার রূপেই নগেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরিচিত। কিন্তু পণ্ডিত, সাধক, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক, সুবক্তা, যুক্তি-নিপুণ তার্কিক ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ত্যাগী ধর্মপ্রচারক রূপে এক কালে বঙ্গীয় সমাজে তিনি অশেষ খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার রচনাশৈলী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আশা করা যায় বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের এই একনিষ্ঠ সেবকের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ও তাঁহার কীর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবে।

আষাঢ় ১৩৭২

অনন্তের উপাসনা

ইয়োরোপের অনেক খ্রীষ্টিয়ান এই বলিয়া অবতারবাদ সমর্থন করেন যে, আমরা সসীম হইয়া অসীমের ভাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? পরমেশ্বর যীশুরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে পারি। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের দেশের পুনরুত্থানকারিগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 'পরিমিত হইয়া আমরা সেই অনন্ত পুরুষকে কেমন করিয়া জানিব? তাঁহাকে জানা যদি না যায় তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা কেমন করিয়া হইবে? সুতরাং প্রতিমাপূজা ও অবতার স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক।'

অনন্তকে কি আমরা জানিতে পারি না? প্রাচীন মহর্ষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর করি, অনন্তকে জানি এমন নহে, জানি না এমনও নহে।

অনন্তকে জানা যায় না বলিলে কি বুঝায়? এই বুঝায় যে, অনন্তকে জানি। যে বিষয় আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহা জানা যায় কি না যায় তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু যাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে উহাকে জানা যায় না, তাহার বিষয়ে অবশ্য কিছু জানি। নতুবা কেমন করিয়া জানিলাম যে উহাকে জানা যায় না?

যথার্থই যদি অনন্তের জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে ইহাই বলিতাম যে, অনন্তকে জানা যায় কি না যায় এ দুইয়ের কিছুই জানি না। যখন বলিতেছি যে অনন্তকে জানা যায় না তখন ইহা নিশ্চয় যে, অনন্ত কি, তাহার ভাব আমার মনে নিশ্চয়ই আছে। অনন্ত যদি

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইত তাহা হইলে উহাকে জানা যায় কি না তাহা কখনই বলিতে পারিতাম না।

এ বিষয়ে আর একটি কথা এই যে, পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। অনন্ত ও পরিমিত এ উভয় আপেক্ষিক। হ্রস্ব বলিলেই দীর্ঘ বুঝায়, দীর্ঘ বলিলেই হ্রস্ব বুঝায়; স্থূল বলিলে সূক্ষ্ম বুঝায়, সূক্ষ্ম বলিলে স্থূল বুঝায়। ভাল বলিলে মন্দ বুঝায়, মন্দ বলিলে ভাল বুঝায়। হ্রস্বের জ্ঞানের মধ্যে দীর্ঘের জ্ঞান আছে, দীর্ঘের জ্ঞানের মধ্যে হ্রস্বের জ্ঞান আছে; স্থূলের জ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্মের জ্ঞান আছে, সূক্ষ্মের জ্ঞানের মধ্যে স্থূলের জ্ঞান আছে; ভালর জ্ঞানের মধ্যে মন্দের জ্ঞান আছে, মন্দের জ্ঞানের মধ্যে ভালর জ্ঞান আছে। এই সকল জ্ঞান পরস্পর আপেক্ষিক। একটির জ্ঞানের মধ্যে আর একটির জ্ঞান আছে। আপেক্ষিক জ্ঞান, বাস্তবিক এক জ্ঞান; অথবা একই জ্ঞানের দুই দিক। সেইরূপ, অনন্তের জ্ঞান ও পরিমিতের জ্ঞান একই জ্ঞান; অথবা একই জ্ঞানের দুই দিক। সুতরাং পরিমিতের জ্ঞানের মধ্যে অনন্তের জ্ঞান রহিয়াছে এবং অনন্তের জ্ঞানের মধ্যে পরিমিতের জ্ঞান রহিয়াছে। পরিমিত বলিলেই অনন্ত বুঝায়, অনন্ত বলিলেই পরিমিত বুঝায়। পরিমিত কি? না, যাহা অনন্ত নহে। অনন্ত কি? না, যাহা পরিমিত নহে। পরিমিত ও অনন্ত পরস্পর পরস্পরকে প্রকাশ করিতেছে।

এ স্থলে আর একটি কথা। অনন্তের জ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তাহা হইলে ভাষায় 'অনন্ত' শব্দ কেমন করিয়া আসিল? মানুষের মনের ভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশ হয়। যদি অনন্তের ভাব মানুষের মনে না থাকিত, তাহা হইলে 'অনন্ত' শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইল?

মনুষ্যের যে অনন্তের জ্ঞান আছে, দেশ (space) ও কালের বিষয় আলোচনা করিলে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। পরিমিত দেশখণ্ড চিন্তা করুন। উহার ও পারে কি? অবশ্য দেশ। আবার তাহার পরে কি? অবশ্য দেশ। এইরূপে দেখিবেন দেশের শেষ পাইবেন না। ক্ষুদ্র বালকদের এই অসীম দেশের জ্ঞান থাকে না। সেই জন্য অনেক বালক মনে করে যে, বাঁশের উপর বাঁশ তাহার উপর বাঁশ, তাহার উপর বাঁশ, এইরূপে ক্রমাগত বাঁশের উপর বাঁশ রাখিতে পারিলে শেষে আকাশে গিয়া ঠক্ করিয়া ঠেকিবে। ক্ষুদ্র বালকদের মনে অসীম আকাশের ভাব বিকশিত হয় নাই, সেই জন্য তাহারা মনে করে যে ঐ নীল আকাশই শেষ।

সেইরূপ কালের বিষয় চিন্তা করুন। কাল আছে ঘটনা নাই, এরূপ কখন হইতে পারে না। আবার ঘটনা আছে কাল নাই, এরূপও কখন হইতে পারে না। কোন ঘটনা ঘটিতেছে, কিন্তু কালে ঘটিতেছে না, এরূপ কি কেহ মনে করিতে পারেন? ঘটনা ও কাল এ দুই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই মুহূর্তে যে ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা অবশ্য কালে ঘটিতেছে। এই ঘটনার পূর্বে অবশ্য কাল আছে। কাল থাকিলেই অবশ্য ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্বে অবশ্য কাল আছে, কাল থাকিলেই ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পূর্বে অবশ্য কাল আছে, কাল থাকিলেই ঘটনা আছে, ইত্যাদি। এইরূপে মানবচিত্ত অনাদিকালে প্রসারিত হইয়া পড়ে।

যেমন ভূতকাল সম্বন্ধে, সেইরূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বর্তমান ঘটনার পরে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। আবার সে ঘটনার পরে অবশ্য কাল আছে। কাল আছে, সুতরাং ঘটনা আছে। এইরূপে মানবচিত্ত অনন্তকালে প্রসারিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ আলোচনাদ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের অনন্তের জ্ঞান নিশ্চয় আছে। আমাদের জ্ঞানকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহার মধ্যে অনাদি অনন্ত কালের জ্ঞান বর্তমান রহিয়াছে।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে, অনন্তের জ্ঞান অভাবাত্মক মাত্র। এ কথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনন্তের জ্ঞান ভাবাত্মক। অনন্ত কি? পরিমিত অপেক্ষা যাহা বড় তাহাই অনন্ত। সুতরাং অনন্তের জ্ঞান ভাবাত্মক। অজ্ঞান বা অন্ধকারের ন্যায় অভাবাত্মক নহে।

তবে অনন্তকে বুঝি না, এ কথার তাৎপর্য কি? এ কথার তাৎপর্য এই যে, আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পারি না। একেবারেই বুঝি না, এমন নহে।

কেবল অনন্ত বলিয়া কেন? পরিমিত পদার্থেরই কি আমাদের পূর্ণজ্ঞান আছে? কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এই পৃথিবী কত বড়, ইহার ব্যাস পরিধির পরিমাণ কি, তাহা আমরা জানি। কিন্তু মনে পরিষ্কাররূপ কি আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি? সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, পৃথিবীর একটি অংশ মাত্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করুন। হিমালয় পর্বতের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য আমরা জানিতে পারি। কিন্তু আমাদের চিত্ত সমগ্র হিমালয়কে কি সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে? হিমালয় ত একটা অতি প্রকাণ্ড পদার্থ। ও দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিন। একটি বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। একটি সমগ্র বৃক্ষকে কি আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি? বৃক্ষের মূল হইতে সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত—তাহার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফল সমুদয় একসঙ্গে কি চিন্তা করিতে পারি? ইহাই কি সত্য নহে যে, একটি বৃক্ষকে আমরা সমগ্রভাবে কখনই ভাবিতে পারি না? উহার এক অংশ ভাবিতে গেলে উহার অন্য অংশ মন হইতে সহজেই

সরিয়া পড়ে। এটা ভাবিতে গেলে ওটা থাকে না, ওটা ভাবিতে গেলে এটা থাকে না। একত্র সকলগুলিকে সমভাবে ভাবিবার আমাদের শক্তি নাই। বৃক্ষ বলিলে স্থূলভাবে একটা বৃক্ষের জ্ঞান হয়, কিন্তু বিশেষভাবে প্রত্যেক অংশের পরিষ্কার জ্ঞান হয় না। এরূপ জ্ঞানকে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা symbolic conception বলেন। একটা বাড়ীর সকল ঘর, সকল দরজা, জানালা, কড়িকাঠ, বরগা কেহ এক সময়ে এক সঙ্গে সমভাবে মনে করিতে কি পারেন? কখনই না। মানুষের মন এতই ক্ষুদ্র। যে ঘরে আমি বসিয়া আছি, তাহার বাহিরে রৌদ্র রহিয়াছে ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই রৌদ্র কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত মনে কি তাহার ধারণা হয়? যখন পরিমিত বিষয়েরই ধারণা হয় না তখন অনন্তের ধারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? তবে পরিমিতের জ্ঞান যেমন সম্ভব অনন্তের জ্ঞানও সেইরূপ সম্ভব। আমাদের যেমন পরিমিতের জ্ঞান আছে সেইরূপ অনন্তের জ্ঞানও আছে।

অনন্ত পুরুষের উপাসনা সম্ভব নহে, এই কথাটা কেহ কেহ আর এক প্রকার করিয়া বলেন। তাঁহারা বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব নহে। সগুণের উপাসনা সম্ভব। এ বিষয়টির মীমাংসা করিতে হইলে নির্গুণ ও সগুণ তাহাকে বলে বুঝা আবশ্যক।

নির্গুণ ও সগুণ কাহাকে বলে? সত্ত্ব রজ ও তম গুণের অতীত যাহা তাহাই নির্গুণ; এবং সত্ত্ব, রজ ও তম গুণবিশিষ্ট যাহা, তাহাই সগুণ।

তাহার পর প্রশ্ন এই যে, সত্ত্ব, রজ ও তম কাহাকে বলে? ব্রহ্মশক্তি তিন রূপে জগতে কার্য করিতেছে;—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পন্ন করিতেছে। সেই তিন রূপ, সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্ব কি?

সগুণ ; কেননা গুণ লইয়া তাঁহার কার্য। কিন্তু তিনিই আবার জগতের অতীত, সুতরাং তিনি নির্গুণ। জগতের অতীত তাঁহার যে সত্তা, তাহা ত্রিগুণের অতীত।

যাঁহারা বলেন, সগুণ ব্রহ্মকে জানা যায় কিন্তু নির্গুণকে জানা যায় না, তাঁহাদের বড়ই ভ্রান্তি। ভ্রান্তি এই জন্য বলি যে, নির্গুণ বলিলেই যে, জ্ঞানাদিলক্ষণবিবর্জিত, এরূপ বুঝায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্রহ্মশক্তি জগতে যতদূর প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পরিমিত, আপেক্ষিক (relative)। যাহা কিছু পরিমিত, আপেক্ষিক, তাহাই আমরা জানি। তদতিরিক্ত কিছু জানি না। আমরা আপেক্ষিককে জানি ; পূর্ণপদার্থের (Absolute) কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং জগতের অতীত নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

আমাদের আপেক্ষিকের জ্ঞান আছে কিন্তু পূর্ণপদার্থের জ্ঞান নাই, ইহা নিতান্তই অযুক্ত কথা। আপেক্ষিক, অপূর্ণ, এবং পূর্ণ (Absolute) এই উভয়ের জ্ঞান, আপেক্ষিক জ্ঞান (co-relative ideas)। যে হ্রস্বকে জানে, সে যেমন দীর্ঘকেও জানে, যে ভালকে জানে, সে যেমন মন্দকেও জানে, সেইরূপ যে আপেক্ষিককে (relative) জানে, সে পূর্ণকেও (Absolute) জানে। অপূর্ণ কি ? না যাহা পূর্ণ নহে। পূর্ণ কি ? না, যাহা অপূর্ণ নহে। সুতরাং এই উভয়ের জ্ঞান পরস্পরসাপেক্ষ অথবা আপেক্ষিক। একটিকে ছাড়িয়া আর একটির জ্ঞান হয় না। অথবা ইহা বলিলেও হয় যে, উহা একই জ্ঞানের দুই দিক।

কেহ কেহ বলেন যে, আমরা যাহা কিছু জানি সকলই দেশকালের মধ্য দিয়া জানি। সুতরাং দেশকালের অতীত যাহা, তাহার জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই কথাটার যুক্তিযুক্ততা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

দেশের (space) জ্ঞানটা কি ? দেশের জ্ঞানে এখান ও সেখানের সম্বন্ধ দেখিতেছি। কেবল এখানকার জ্ঞান দেশের জ্ঞান নহে ; অথবা কেবল সেখানকার জ্ঞান দেশের জ্ঞান নহে। এখান বলিলেই সেখান বুঝায়। এখান ও সেখান, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের যে জ্ঞান, তাহাই দেশের জ্ঞান। আমাদের জ্ঞান কেবল 'এখানে' বদ্ধ নহে অথবা কেবল 'সেখানে' বদ্ধ নহে। এই উভয়ের সংযোগে দেশের জ্ঞান। জ্ঞান নিজে 'এখান' ও 'সেখান'কে সংযুক্ত করিতেছে। তাহাতেই দেশের জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। জ্ঞান 'এখানে' বদ্ধ নহে, 'সেখানে' আছে, এবং 'সেখানে' বদ্ধ নহে 'এখানে' আছে। সুতরাং জ্ঞান কোনটাতেই বদ্ধ নহে ; জ্ঞান 'এখান' আর 'সেখান' এই দুইয়েরই অতীত। জ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে থাকিয়া অথচ দুইয়ের অতীত হইয়া এই দুইকে সংযোগ করিতেছে ; এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। জ্ঞান 'এখান' ও 'সেখানে'র অতীত না হইলে, 'এখান' 'সেখানে'র সংযোগ সাধন করিতে পারে না।

যদি আমাকে দুটা পদার্থের সংযোগ করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে সেই দুই বস্তুর অতীত হওয়া চাই। আমার হাতের মধ্যে দুটা বস্তুকে না পাইলে সেই দুইয়ের সংযোগ কেমন করিয়া করিব ? সুতরাং আমি সেই দুইয়ের অতীত। আমাদের জ্ঞান যে, দেশের মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জ্ঞান দেশের অতীত।

কাল সম্বন্ধেও সেই কথা। আমাদের কালের জ্ঞান কি ? 'এখন' ও 'তখন' এর সম্বন্ধ। আমাদের জ্ঞান 'এখন' ও 'তখন' উভয়ের অতীত না হইলে উভয়কে কখন সংযুক্ত করিতে পারিত না ; উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত না। দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে,

সে সকল কথাই কাল সম্বন্ধে খাটে। সুতরাং প্রমাণ হইল যে, আমাদের জ্ঞান যেমন দেশ ও কালের অন্তর্গত, সেইরূপ দেশ ও কালের অতীত।

যাঁহারা বলেন যে, জগতের সকল পদার্থ ও ঘটনা দেশ ও কালের অন্তর্গত, এবং আমরা দেশকালের মধ্য দিয়াই সকল বিষয় জানি, সুতরাং জগতের অন্তর্গত বিষয়ই জানিতে পারি, জগতের অতীত বিষয় জানিতে পারি না, তাঁহাদের কথার অযুক্ততা ও অসারতা প্রতিপন্ন হইল। আমাদের জ্ঞান যখন দেশ কালের অন্তর্গত হইয়াও দেশ-কালের অতীত, তখন দেশকালাতীত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন?

জগতের অতীত যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানা যায় না, সুতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব নহে, এ কথার অসারতাও প্রমাণিত হইল। জগতের অন্তর্গত বিষয়ের জ্ঞান ও জগতের অতীত বিষয়ের জ্ঞান, এক অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ। দেশকালের মধ্য দিয়া যে জানে সে দেশকালের অতীতকেও জানে;—সগুণকে যে জানে সে নির্গুণকেও জানে। সগুণকে না জানিলে নির্গুণকে জানা যায় না; এবং নির্গুণকে না জানিলে সগুণকে জানা যায় না।

আমি নিজে সগুণ ও নির্গুণ দুই, তবে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারিব না কেন? আমি জগতের মধ্যে অথচ জগতের অতীত।

দেশকালের সীমাকে যে জানে সে অবশ্য সীমাকে অতিক্রম করে। অসীমের জ্ঞান না থাকিলে সসীমের জ্ঞান অসম্ভব। অসীম কি? না, যাহা সসীম নহে। সসীম কি? না, যাহা অসীম নহে। এই উভয় জ্ঞান আপেক্ষিক। অসীমের জ্ঞানের মধ্যে সসীমের জ্ঞান, এবং সসীমের

জ্ঞানের মধ্যে অসীমের জ্ঞান। এই দুই প্রকার জ্ঞান বাস্তবিক একই জ্ঞানের দুই দিক। আমি সীমা অতিক্রম না করিলে সীমাকে জানিতে পারি না। দেশকালের সীমার অতীত না হইলে দেশকালের সীমাকে জানিতে পারি না। সুতরাং আমি যেমন দেশকালের মধ্যে, সেইরূপ আমি দেশকালের অতীত।

আর এক প্রকারে এই বিষয়টি বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই প্রকার ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব হয় না। আত্মা জ্ঞাতা, জগৎ জ্ঞেয়। জ্ঞাতা অবশ্য জ্ঞেয় বিষয়ের অতীত। সুতরাং আত্মা অবশ্য জগতের অতীত। জ্ঞাতা আত্মা অবশ্য সমস্ত জ্ঞেয় জগতের অতীত। বিষয়ী ও বিষয় এই উভয় ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব হয় না। বিষয়ী অবশ্য বিষয়ের অতীত। আত্মা বিষয়ী, জগৎ বিষয়। সুতরাং আত্মা জগতের অতীত। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় অন্তরে বাহিরে সকলই phenomena, আত্মা noumenon,-আত্মা এই সকলের সাক্ষী, সুতরাং এই সকলের অতীত। সুতরাং আত্মা জগতের মধ্যে থাকিয়াও জগতের অতীত। সুতরাং আত্মা সগুণ নির্গুণ দুই। ব্রহ্ম যিনি তিনিও সগুণ নির্গুণ দুই। তবে আত্মা ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে না কেন?

ঘটনা সকল কালে ঘটিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। এই মুহূর্তে যাহা বর্তমান, পর মুহূর্তে তাহা অতীত। ঘটনাপ্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। কালস্রোত বা ঘটনাস্রোত নদীস্রোতের ন্যায় ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। একবারও স্থির হইয়া দাঁড়ায় না। এই আছে, ঐ চলিয়া গেল। কালপ্রবাহ ক্রমাগত প্রবাহিত হইতেছে, ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে, এক মুহূর্ত স্থায়ী নহে। কিন্তু আত্মা বা আমি একই রহিয়াছি। সকলই কালে আসিতেছে, কালে যাইতেছে, কিন্তু

আমি কালাতীত হইয়া রহিয়াছি। সকলের সাক্ষীরূপে সকল বিষয়ের পশ্চাতে এই স্থায়ী আত্মা বা আমি। এই আমি বা আত্মা চিরদিনই এক রহিয়াছে। সেই জন্য স্মৃতি সম্ভব হইতেছে। সকলই কালস্রোতে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আত্মা বা আমি কালস্রোতের অতীত হইয়া সেই সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতেছে। সেই জন্যই স্মৃতি সম্ভব হইতেছে। এইরূপে জীবাত্মার নির্গুণত্ব বুঝা যায়। তবে নির্গুণ জীবাত্মা, নির্গুণ পরমাত্মাকে জানিতে পারিবে না কেন?

কোন কোন ব্যক্তি নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা সকল দিক্ দিয়াই বন্ধ করিয়া দিতে চান। তাঁহারা বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না, কেননা নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু সগুণ ও সাকার একই। সুতরাং নিরাকার উপাসনা সকল দিক্ দিয়াই অসম্ভব।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে হইতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন সগুণ ব্রহ্মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাক। সগুণ বলিলে সাকার বুঝায়, এ কথা কে বলিল? সগুণ অর্থে সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্ট, এইমাত্র। সগুণ হইলে যে সাকার হইবেই হইবে, ইহা কে বলিল?

কবি রবীন্দ্রনাথ অনন্তের জ্ঞান বুঝাইবার জন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কোন ব্যক্তি মনে করিলেন যে তিনি সমুদ্র দর্শনে গমন করিবেন। তজ্জন্য তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্র দর্শনে যাইবার কথা শুনিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, সমুদ্র দর্শন কখনই সম্ভব নহে। মানুষ অকূল সমুদ্রের কতটুকু দেখিতে

পায়? তাহার দৃষ্টি কতদূর চলে? মানবের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ। সুতরাং মহাসমুদ্র দর্শন কেবল কথার কথামাত্র। সমুদ্র দর্শন কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং স্থির হইল যে বসিয়া বসিয়া বাটীর ডোবা দর্শন করাই শ্রেয়!

সমুদ্রদর্শন সম্বন্ধে ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শ যেমন, অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে অনেক লোকের উপদেশও সেই প্রকার। মানুষ অনন্ত ব্রহ্মের কতটুকু জানিতে পারে? তাহার জ্ঞান কতদূর চলে? মানবের জ্ঞানচক্ষু অতি ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ। অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা কেবল কথার কথামাত্র। অনন্ত ব্রহ্মপূজা কখনই সম্ভব নহে।

অনন্ত আকাশ কি আমরা সব দেখিতে পাই? নিশ্চয়ই উহার অতি অল্প অংশ দেখিতে পাই। তবে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে আকাশ দেখার সাধ মিটে না কেন? কেননা আমার যতদূর সাধ্য ততদূর দেখা হয় না। আমার যতদূর দেখিবার ক্ষমতা ততদূর দেখিব, তাহার পর বুঝিতে পারিব যে, আরও আছে! আরও আছে! সীমা নাই! ইহাতেই আকাশ দেখার আনন্দ।

সেইরূপ সেই অনন্ত পুরুষ সম্বন্ধে। আমার মন যতদূর সাধ্য ধাবমান হইল। শেষে আরও, আরও, সীমা পাই না, সীমা নাই! তখন অবাক্ হইয়া বলি, ধন্য প্রভো! ধন্য তুমি! তোমাকে কেহ বুঝিতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা সকলই পরাস্ত হইয়া যায়! ধন্য প্রভো! ধন্য!

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন তিনি কাহাকেও ভয় করেন না।

কেহ লোকচক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিবার জন্য ঐ শ্রুতি বাক্যের প্রথমার্ধ উদ্ধৃত করিয়া শেষার্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমার্ধদ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে মানুষ সেই অনন্ত পুরুষকে জানিতে পারে না। কিন্তু শেষার্ধ উদ্ধৃত করিলে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না, সুতরাং শেষার্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমগ্র শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলে তাঁহাদের মত বজায় থাকে না। সুতরাং অতি সাবধানে শেষার্ধ পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

অনেক লোকে বলেন যে, পরমেশ্বর অনন্ত; সুতরাং তাঁহার উপাসনা সম্ভব নহে। আমি ইহার বিপরীত কথাই সত্য বলিয়া মনে করি। অনন্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা হয় না এমন নহে, তিনি অনন্ত বলিয়াই উপাস্য। যে পরিমিত, যে ক্ষুদ্র, সে অনন্তমুখী মানবাত্মার পক্ষে কেমন করিয়া উপাস্য হইবে? আমার ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান ও বুদ্ধি যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে সে আমার উপাস্য কেমন করিয়া হইবে? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি যাহাকে জানিয়া ফুরাইয়া ফেলিতে পারে সে আমার উপাস্য কেমন করিয়া হইবে? তিনি অনন্ত বলিয়াই উপাস্য। যাহা ক্ষুদ্র, পরিমিত, তাহা আমার উপাস্য কেমন করিয়া হইবে? যদি বল অনন্তের উপাসনা কঠিন, সে কথার উত্তর এই যে, ধর্মই তো কঠিন। ফাঁকি দিয়া ধর্ম হয় না। ভগবানের ভজন সাধন ফাঁকি দিয়া হয় না।

অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তি নাই। এ কথার তাৎপর্য কি? একটু চিন্তা করিলেই এ কথার তাৎপর্য বুঝা যায়। মানুষ আপনার মন দিয়া আপনার দেবতা গড়ে। বাইবেল গ্রন্থে আছে,

God made man out of his own image—পরমেশ্বর আপনার প্রতিকৃতিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে ইহার বিপরীত কথাই সত্য: Man makes God out of his own image—মনুষ্য আপনার প্রতিকৃতিতে তাহার পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করে। মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, যদি মহিষের ঈশ্বরজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে সে মনে করিত যে, পরমেশ্বর একটি প্রকাণ্ড বলবান মহিষ, স্বর্গের মাঠে সুখে বিচরণ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি তাহার সয়তানের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে সে মনে করিত যে, সয়তান এক শীর্ণ দুষ্ট মহিষ, ঈশ্বর-মহিষের সহিত সর্বদা গুঁতাগুঁতি করিতেছে!

জগতে দেখা যায়, যাহার যেমন মন তাহার ঈশ্বরজ্ঞান সেইরূপ। লোকে শত্রুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করে। মোকদ্দমায় জয়ী হইবার জন্য নানা প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেক সময় একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়,—কালীঘাটে মার পূজা ও মার নিকট ছাগ বলি। মা কালী যেন ঘুষখোর! পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় জয়দান করিবেন। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে কালীপূজা করে। যাহাতে ডাকাতি কার্যে,—অন্যায়পূর্বক পরের সর্বাস্বপহরণ কার্যে, কৃতকার্য হইতে পারা যায়, তজ্জন্য মার পূজা! আমার নিবাস গ্রামের নিকটে এক 'ডাকাতে কালী' আছেন। কি ভীষণ মূর্তি! পূর্বে ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে উঁহাকে পূজা দিয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলিয়াছেন, 'আমরা যদি আমাদেরই প্রবৃত্তি, আমাদেরই আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি, তবে তাহার মধ্যে মুক্তি

কোন খানে! যদি তাহাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোয়াই, এমন কি তাহার জন্য নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি, তবে তাহার ফল কি হয়? তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতা করিয়া পূজা করা হয়। আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা, আমাদের ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি। এই কারণেই কালীকে দস্যু, আপন দস্যুবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে। মিথ্যাশপথকারী আদালতে জয়লাভের জন্য পঞ্চমানৎ করে, এমন কি, যে সকল অন্যায়, অবিচার, দুষ্কর্ম, মনুষ্যলোকে গর্হিত বলিয়া খ্যাত, দেবচরিত্রে তাহা অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়।

এ সকল কথা অতি সত্য। সেই জন্য দেখুন একটা প্রচলিত কথা আছে :

'দেবতার বেলা লীলা খেলা।
পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা॥'

ইহার একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, মা চণ্ডীর বড় ইচ্ছা হইল যে, তিনি পৃথিবীতে আপনার পূজা প্রচার করেন। কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইলেন। যদি কোন দেবতা মানবরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কিন্তু দেবতা কেমন করিয়া মানবরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবেন? ইহা কি সম্ভব? তখন মা চণ্ডী একটি কৌশল স্থির করিলেন। নারদের উপদেশে অসুরদিগের ভয়ে ইন্দ্র প্রতিদিন শিবপূজা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র নীলাম্বরকে আদেশ করিলেন যে নন্দনকানন হইতে শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিয়া দিতে হইবে। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর নন্দনকানন হইতে শত প্রকার পুষ্প আহরণ করিলেন।

মা চণ্ডী পুষ্পের মধ্যে পিপীলিকারূপে বসিয়া থাকিলেন। যখনই দেবরাজ পূজার সময় মহাদেবের মস্তকে পুষ্প দিলেন অমনি পিপীলিকা-রূপিনী মা চণ্ডী কট্ করিয়া কামড়াইয়া দিলেন। মহাদেব জ্বালায় অস্থির! সে কি সহজ কামড়! মা চণ্ডীর কামড়! মহাদেবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন ইন্দ্রদেব মহাদেবকে বলিলেন যে, তিনি কিছু জানেন না, তাঁহার পুত্র নীলাম্বর পুষ্পচয়ন করিয়াছিল। তখন তিনি ইন্দ্রপুত্রকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তিনি যেন স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে গিয়া মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেবের শাপে ইন্দ্রপুত্র গুজরাটের কালকেতু হইলেন।—অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। শেষে তিনি মা চণ্ডীর কৃপায় গুজরাটের রাজা হইলেন। তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে চণ্ডীর মহিমা ও চণ্ডীপূজা প্রচার হইল। কেমন কৌশলে মা চণ্ডী পৃথিবীতে আপনার পূজা প্রচার করিলেন!

কেহ বলিতে পারেন, এ তো পুরাণ নহে, উহা কবিকঙ্কণের কল্পনা মাত্র। কবিকঙ্কণের কল্পনা হইলেও সাধারণ লোকে উহাকেই পুরাণ বলিয়া, সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে। শাস্ত্রে নাই অথচ সাধারণ লোকের নিকট পুরাণ, এমন অনেক বিষয় আছে। যেমন মনসার ভাসান, শিবদুর্গা সম্বন্ধে অনেক গল্প, মেয়েলি ব্রতকথা, সত্য-পীরের কথা, এ সব সাধারণের নিকট পুরাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যপীর প্রথমে মুসলমানের দেবতা ছিলেন। ক্রমে তিনি হিন্দুরও দেবতা হইলেন। হিন্দুর দেবতা হইলে তাঁহার নাম হইল সত্যনারায়ণ।

সময়ে সময়ে অনেক নূতন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে তেত্রিশ জন দেবতা। ক্রমে হইল তেত্রিশ কোটি। শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবতার সময়ে সময়ে সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজদিগের

মতে চারিশত বৎসর পূর্বে যশোর নগরে ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। ওলাউঠা রোগের উৎপত্তির পর এক নূতন দেবতা ওলাবিবির সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ ক্রমাগত দেবতাকে নিজের মত করিয়া গড়িতেছে। দেবতারা আহার করেন, নিদ্রা যান, মলমূত্র ত্যাগ করেন, বিবাহ করেন, সন্তানাদি হয়, পরস্পর দ্বেষ, হিংসা ও ঝগড়া করেন।

যদি বল এ সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, তদ্বিষয়ে তিনটি কথা বলি। প্রথম, সকল বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয় না। দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শিক্ষিত লোকের নিকট। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সাধারণ লোকের নিকট নয়। সাধারণ লোকে সত্য সত্যই মানে, বাস্তব ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করে। তৃতীয়, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পৌত্তলিকতার মৃত্যুচিহ্ন। প্রাচীন রোমেও এইরূপ হইয়াছিল। যখন রোমের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস উপস্থিত হইল, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবী সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। তারপরে উপযুক্ত সময়ে সেণ্ট পল তথায় গিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কয়েক শতাব্দী মধ্যেই সমগ্র দেশ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিল।

কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ঈশ্বরকে মানুষের মত করা মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা। মনুষ্য স্বভাবতঃ আপনার গুণ পরমেশ্বরে আরোপ করে। স্বাভাবিক দুর্বলতা বলিয়া কি উহাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে? দুর্বলতা যাহাতে দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে না? কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত ঐ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছেন, আত্মাপক্ষী যাহাতে ভাল করিয়া কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য জালে জড়াইয়া পড়ে তাহার চেষ্টা

করিতেছেন, মানবের পরিত্রাণের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছেন, সর্বত্রব্যাপী অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন, পরমেশ্বরকে মানবীয় গুণে ভূষিত করিবার প্রবৃত্তি ক্ষীণ না হইয়া যাহাতে বলবতী হয় তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন!

আর একটি কথা। যাঁহারা মনে করেন, এই সকল দেবপূজা অনন্ত ব্রহ্মপূজার সোপানস্বরূপ, তাঁহাদের বড়ই ভুল। দেবতার পূজা করিতে গিয়া মানুষ আপনার প্রবৃত্তি, আপনার ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ থাকে। তাহাতে মুক্তি কোথায়? যে আপনার ক্ষুদ্র ভাবের মধ্যেই বদ্ধ রহিল তাহার মুক্তি কিরূপে হইবে? অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তবে রামপ্রসাদের কেমন করিয়া হইল? এ কথার দুটি উত্তর আছে। প্রথম, তিনি যোগী ও পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তাহার আশ্চর্য কি? দ্বিতীয়, স্বাভাবিক প্রতিভা বাধা প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করে। তিনি স্বাভাবিক অধ্যাত্ম-প্রতিভা বলে কুসংস্কারজাল ভেদ করিয়াছিলেন; নির্ম্মল ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত সাধারণের পক্ষে খাটে না। অন্য সকলের পক্ষে কি হয়? যে পতঙ্গ আকাশে উড্ডীন হইবে, উর্ণনাভির জালে পড়িয়া তাহার ডানা বদ্ধ হইয়া গেল! সাধারণ লোকের সেই দশাই হইয়াছে! যে পক্ষী উচ্চ গগনে উঠিয়া আপনার মধুর স্বরে জগৎকে প্লাবিত করিবে সে আটাকাটিতে পতিত হইয়া ছটফট করিতেছে!

পূজা করিলে ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হয় এ কথা সকলেই জানেন। গাছপাথর, পশুপক্ষী, ভক্তির সহিত যাহারই পূজা কর না কেন, তাহাতে তোমার ভক্তিবৃত্তি অবশ্য চরিতার্থ হইবে। কিন্তু ভক্তি চরিতার্থ হইলেই উপাসনার যাহা চরম উদ্দেশ্য তাহা কি সিদ্ধ হইল?

কখনই না। ভক্তি চরিতার্থ হওয়া ব্যতীত উপাসনার আর একটি মহান উদ্দেশ্য আছে; উপাস্য দেবতার আদর্শে আপনাকে সংগঠিত করা,—আপনার উন্নতি সাধন করা, আপনাকে প্রসারিত করা। প্রচলিত সাকারবাদে সেই মহান উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেননা দেবতাসকল মানবীয় ভাবে গঠিত। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, প্রচলিত দেবপূজায় মানুষ আপনার ক্ষুদ্র ভাবের মধ্যেই আপনি বদ্ধ থাকে। মুক্তি কোথায়?

আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস এই যে, দেবতাজ্ঞানে যে কোন পদার্থের পূজা করিলেই মানুষের মুক্তি হয়। সেই জন্য একটি কথা আছে, 'তুই ঢেঁকি ভজে স্বর্গে যাবি কাজ কি রে তোর লেখা জোখা।' ঢেঁকিকে ভক্তির সহিত ভজনা করিলে ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে পারে, কিন্তু যে চরম উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম, তাহা হয় না। আপনাকে প্রসারিত করা হয় না। নিজের প্রকৃত উন্নতি হয় না।

স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ পাখী ডিমে তা দেয়। কিন্তু যদি সত্য ডিম্বের পরিবর্ত্তে একটা পাথরের ডিম্ব দেওয়া হয়, পাখী স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ সেই ডিম্বেই তা দিবে। তাহাতে তাহার ডিম্বে তা দিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে বটে, কিন্তু তা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ডিম্ব হইতে শাবক বাহির হইবে না।* ইট, কাঠ, পাথরের পূজাতেও তাই হয়। ভক্তি চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু আত্মার বদ্ধভাব ঘুচে না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিজালে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্যই মহাজ্ঞানী প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দেবপূজায় মুক্তি নাই, অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনাতেই মুক্তি। কেননা

* ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫

ব্রহ্মোপাসনায় আত্মা আপনার ক্ষুদ্র ভাবকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় উপস্থিত হয়।

আমাদের অনন্তের ধারণা হয় না বটে, কিন্তু সেই অনন্ত পুরুষকে জানিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করিতে পারি, অনন্তকাল তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে জানিতে পারি। অনন্তকাল তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা করিব, অনন্তকাল তাঁহাকে জানিব। সাধক সেই অনন্ত পুরুষকে ক্রমে ক্রমে অনন্ত জীবনে জানিতে থাকেন। মহাসমুদ্রের জল একটি কলসে ধরে না। কিন্তু কলসের যে পরিমাণ আয়তন, সেই পরিমাণ জল নিশ্চয়ই ধরে। সেই রূপ আমাদের হৃদয়কলসে ব্রহ্মসমুদ্র কি স্থান পায়? কিন্তু আমাদের হৃদয়কলসের যেরূপ আয়তন ব্রহ্মসমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্য ধরে। কিন্তু হৃদয়কলসের এমনি প্রকৃতি যে উহা অনন্তকাল পর্যন্ত ক্রমশঃ বড় হয়। উহাতে ব্রহ্মসমুদ্রের সমস্ত জল ক্রমে ক্রমে স্থান পায়।

অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পার না বলিয়া কল্পনাবলে সেই অনন্ত পুরুষকে ছোট করিও না। আপনাকে বড় কর। আপনার হৃদয়, মন, আত্মাকে প্রশস্ত কর। ক্ষুদ্র অবোধ শিশু তাহার জ্ঞানী পিতার বিষয় কি জানে? তথাচ সে পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারে, পিতাকে ভাল বাসিতে পারে, পিতার ক্রোড়ে বসিতে পারে। পরমেশ্বর ও মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাই। আমরা তাঁহাকে বুঝি আর না বুঝি তাহাতে কি? তাঁহার নিকট আমরা শিশু। তিনি আমাদের পিতা। আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি, তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারি, তাঁহার ক্রোড়ে বসিতে পারি। ঐ ক্ষুদ্র শিশু কি তাহার পিতাকে কোন কালে জানিতে পারিবে না? যত বড় হইবে, ততই জানিতে পারিবে। আমরাও যত বড় হইব, ততই

তাঁহাকে জানিব। অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহাকে ক্রমশঃ জানিতে থাকিব।

তাঁহাকে বুঝি না বলিয়াই তিনি আমাদের উপাস্য। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি যাহাকে বুঝিয়া ফেলিতে পারে সে তো সামান্য বস্তু। কেমন করিয়া সে আমার উপাস্য হইবে? পরিমিতে তৃপ্তি নাই। উপনিষদে প্রাচীন মহর্ষি যথার্থই বলিয়াছেন :

যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

সেই ভূমা মহান ব্যতীত ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

চিন্ময়, নিরাকার, অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

তথাচ বলি, অতীত সাক্ষী ইতিহাস অনন্ত ব্রহ্মপূজার যাথার্থ পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন কালে সক্রেটীস্ প্রভৃতি চিন্ময় অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মহর্ষিগণ পরব্রহ্মকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগতে মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার, ইমার্সন্ প্রভৃতি সেই এক অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মহাত্মা নানক, কবীর প্রভৃতি সেই এক অতীন্দ্রিয় চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন, এবং তাঁহার উপাসনা প্রচার করিয়া শত শত লোককে ধন্য করিয়াছেন।

হে অনন্তব্রহ্মের উপাসকগণ! আপনারা কি নিজের জীবনে, আপনার অন্তরে ব্রহ্মোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিয়া জন্ম সার্থক মনে করেন নাই? আপনারা কি বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া বলিতে

পারেন না যে, সেই অনন্ত নিরাকার পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ পূজা করিয়া আমরা জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছি? যে চিনি খায় নাই, সে বলুক যে চিনি তিক্ত, কিন্তু যে ব্যক্তি চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে কেমন করিয়া বলিবে যে চিনি তিক্ত? ঘরের জানালা কবাট বন্ধ করিয়া যদি কেহ বলে আকাশে সূর্য নাই, সে বলুক; কিন্তু যিনি সূর্যকে আকাশে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন তিনি তাহা কেমন করিয়া বলিবেন? যিনি জীবনে কখন ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদ পান নাই তিনি ব্রহ্মোপাসনার উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ব্রহ্মোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল আপনার জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তিনি তাহা কেমন করিয়া করিবেন?

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

বহুকাল হইতে এদেশে সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও যে উক্তরূপ মতদ্বৈধ ছিল, প্রাচীন আর্যশাস্ত্রসকলে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনাতন কালে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে,—কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীকাল হইতে—এই মতবিরোধ প্রবলতর হইয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইতে সাকার ও নিরাকারবাদ লইয়া একটী বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত যেখানে কেন গমন কর না দেখিবে, লোকে সাকার ও নিরাকারবাদ বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা বিষয়ে লোকে বলিতেছেন, নিরাকারের উপাসনা কেমন করিয়া হইবে? নিরাকার কেমন করিয়া ভাবিব? নিরাকার ধ্যান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর হওয়া আবশ্যক,—নিরাকার পদার্থ আছে কি না? নিরাকার উপাসনা হইতে পারে কি না, নিরাকারের ধ্যান সম্ভব কি না, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পূর্বে জানা উচিত, আদৌ নিরাকার পদার্থ আছে কি না।

নিরাকার পদার্থ আছে কি না, শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মূল কি? শক্তি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে? শক্তি হইতে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় দৃষ্ট

হইতেছে,—তাহার মূলে কি? মূলে শক্তি। রূপরসাদির উৎপত্তি শক্তি হইতে, কিন্তু শক্তি রূপরসাদি গুণবিবর্জিত। শক্তি নিরাকার। কার্যকারণতত্ত্ব বুঝিতে হইলে শক্তিতত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। রূপরসাদির উৎপত্তি বা প্রকাশের কারণ শক্তি। সুতরাং শক্তি রূপরসাদি-বিবর্জিত। শক্তি নিরাকার।

তোমার হস্তে শক্তি আছে। সেই শক্তিদ্বারা তুমি নানা প্রকার কার্য করিতেছ। তোমার হস্ত সাকার কিন্তু শক্তি নিরাকার। তোমার পদে শক্তি আছে। সেই শক্তিধারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছ। সেই শক্তির সাহায্যে পদাঘাতে ঐ কলসটীকে এখনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। তোমার পদ সাকার কিন্তু শক্তি নিরাকার। ঐ জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে। উহাতে যাহা কিছু পড়িতেছে তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ জলরাশির সম্মুখে কিছুই স্থির হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ঐ জলরাশির আকার দেখিতেছি। কিন্তু উহাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহা নিরাকার। প্রত্যেক জলকণিকা সাকার কিন্তু তাহাতে অধিষ্ঠিত শক্তি নিরাকার। ঐ বাষ্পরাশি কেমন সূক্ষ্ম ও তরল। জল অপেক্ষা কতগুণে অধিকতর তরল, কিন্তু উহাতে যে শক্তি অধিষ্ঠিত তাহা অতি প্রকাণ্ড অর্ণবপোতকে অর্ণববক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে, সুদীর্ঘ বাষ্পীয় শকটশ্রেণীকে এক মাসের পথ এক দিনে পৌঁছিয়া দিতেছে। এই যে বায়ুরাশি প্রবাহিত হইতেছে উহা অদৃশ্য হইলেও সাকার। উহাতে যে শক্তি স্থিতি করিতেছে তদ্দারা পদার্থ সকল আন্দোলিত, বিতাড়িত ও বিচূর্ণ হইয়া যায়। বায়ু অদৃশ্য হইলেও সাকার, উহা স্পর্শদ্বারা অনুভূত। কিন্তু উহাতে যে শক্তি অধিষ্ঠিত তাহা নিরাকার। তড়িত একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ;—সূক্ষ্ম জড়। কিন্তু তড়িতে যে শক্তি রহিয়াছে

তাহাতে পর্বত বিকম্পিত হয়, এই সুগঠিত সুদৃঢ় অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া যায়। তড়িত সূক্ষ্ম জড়, কিন্তু উহাতে যে শক্তি স্থিতি করিতেছে তাহা অজড়, নিরাকার।

নিরাকার পদার্থ আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে এই একটী সহজ কথা বলি যে, মানুষের মন এবং মনের অবস্থাসকল, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, দয়া, প্রেম ইত্যাদি নিরাকার!

এমন লোক আছেন, যাঁহারা একথায় সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা বলেন, মনের আকার আছে। মনের যে আকার আছে তাহার প্রমাণ কি? একটী প্রমাণ শুনা গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, মার্কিনদেশীয় প্রেততত্ত্ববাদীরা (spiritualists) পরলোকগত আত্মার ছবি দিতে পারেন। জীবিতকালে যে ব্যক্তির যে প্রকার মূর্তি ছিল তাহার সহিত উক্তরূপ ছবির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আত্মা নিরাকার পদার্থ হইলে উক্তপ্রকার ছবির উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?*

যাঁহারা এই তর্কটী উপস্থিত করেন, তাঁহারা প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মত কিছুই জানেন না। প্রেততত্ত্ববাদীরা সূক্ষ্ম দেহে বিশ্বাস করেন। পরলোকগত আত্মা সূক্ষ্মদেহী। মৃত্যুর সময় স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া আত্মা কেবল সূক্ষ্মদেহে অধিবাস করে। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন যে তাঁহার যে ছবি দিয়া থাকেন, তাহা আত্মার ছবি নহে, ঐ সূক্ষ্ম দেহের ছবি। সুতবাং উক্তরূপ ছবির উৎপত্তি আত্মার সাকারত্ব প্রতিপন্ন করে না।

মন সাকার কি নিরাকার? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী

* পুনরুত্থানকারী দলের একজন প্রধান নেতা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এই যুক্তিটী ব্যবহার করিয়াছেন।

গুণের কোনটিই মনের গুণ নহে। উহার মধ্যে কোনটিই মনে দৃষ্ট হয় না। যদি বল, মন সাকার, তাহা হইলে সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, কি আকার? দীর্ঘ, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, কি আকার? মনের আকার কেহ কখন দেখে নাই, দেখা সম্ভব নহে।

লক্ষণদ্বারা পদার্থ নির্ণয় হয়। এক পদার্থের বিশেষ লক্ষণ অন্য পদার্থে লক্ষিত হয় না। বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদী প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থ বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। বৃক্ষের যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা লতায় নাই; লতার যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা নদীতে নাই; নদীর যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা পর্বতে নাই। গো, অশ্ব, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি প্রত্যেক জীব বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। গরুর বিশেষ লক্ষণ অশ্বে নাই,—অর্থাৎ গরুতে যাহা বিশেষ কিছু দেখিয়া গরুকে গরু বলিয়া মনে করি তাহা অশ্বে নাই। আবার অশ্বে যাহা কিছু বিশেষ আছে, অর্থাৎ যাহাতে অশ্বকে অশ্ব বলিয়া মনে করি, তাহা গরুতে নাই। পক্ষীর যাহা বিশেষ গুণ তাহা মনুষ্যে নাই এবং মনুষ্যের যাহা বিশেষ গুণ তাহা পক্ষীতে নাই। পদার্থসকলের বিশেষ লক্ষণ দ্বারাই পদার্থের বিভিন্নতার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জগতের সকল পদার্থ যে একই পদার্থ নয় তাহা কেবল বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা আমাদের প্রতীতি হয়। জল মৃত্তিকা নয়, মৃত্তিকা জল নয়। জল ও মৃত্তিকার গুণভেদের জন্যই এই বোধ সম্ভব।

মন ও স্থূল জড় সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনের যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা জড়পদার্থে নাই, স্থূল জড়ের যাহা বিশেষ লক্ষণ, তাহা মনের লক্ষণ নহে। মনের বিশেষ লক্ষণ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা; জড়ের বিশেষ লক্ষণ আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ ইত্যাদি; মনের যাহা গুণ তাহা স্থূল জড়ে দেখিতে পাই না, এবং স্থূল জড়ের যাহা গুণ, তাহা মনে দেখিতে পাই

না। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, জড় পদার্থে দেখিতে পাই না; আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ, মনে দেখিতে পাই না। সুতরাং মনকে সাকার পদার্থের মধ্যে পরিগণিত করা যে কতদূর অযুক্ত ও হাস্যকর, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যদি মনকে সাকার বল, তাহা হইলে এই গৃহটি, ঐ বৃক্ষটি, ঐ নদীটিকে নিরাকার বল না কেন? মনকে যদি সাকার বলিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই গৃহটিকেও নিরাকার বলিবার অধিকার থাকিবে না কেন? ইহাও যেমন যুক্তিযুক্ত, উহাও তেমনি। মনের আকার আছে, ইহা হাস্যের কথা। একজন আপনার চঞ্চল মনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন 'মনটার যদি আকার থাকিত, আমি তাহার গালে তিন চড় লাগাইতাম।'

এ স্থলে অনেকে বলিবেন যে, নিরাকার পদার্থের সত্তা স্বীকার করিলেও ইহা বলিতেই হইবে যে, সাকার ব্যতীত নিরাকারের জ্ঞান লাভ হয় না। সাকারের দ্বারা আমরা নিরাকারকে ধরিতে পারি। ইহা কি যুক্তিযুক্ত কথা?

পূর্ববর্তী কে? নিরাকার না সাকার? আমার যে জ্ঞান আছে, তাহা কে বলিয়া দেয়? জ্ঞান আপনাকে আপনি প্রদর্শন করে। জ্ঞান আপনার সাক্ষী আপনি। জ্ঞানদ্বারাই বুঝিতে পারি যে জ্ঞান রহিয়াছে। সূর্য যেমন আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত, জ্ঞানও সেইরূপ আত্মজ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত। জড় আছে, সাকার পদার্থ আছে, কে বলিয়া দেয়? কেমন করিয়া জানিতে পারি যে, এই অসংখ্য অগণ্য সাকার পদার্থ রহিয়াছে? জ্ঞানদ্বারা। জ্ঞান নিজের সত্তা নিজে প্রদর্শন করে এবং এই সুবিশাল বহির্জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়। আমার যে জ্ঞান আছে তাহা জ্ঞানই বলিয়া দিতেছে;

আর ঐ যে সম্মুখে বৃক্ষটি রহিয়াছে উহার সংবাদ কে দিতেছে? জ্ঞানই উহার কথা বলিয়া দিতেছে। জ্ঞান বলিয়া দেয়, সেই জন্য আমরা এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দবিশিষ্ট বহির্জগতের খবর পাই।

এখন দেখ, আগে কি, আর পরে কি? নিরাকার আগে না সাকার আগে? নিরাকার জ্ঞান সাকারের কথা বলিয়া দেয় তবে আমরা সাকারের বিষয় জানিতে পারি। নিরাকার আগে, সাকার পরে। নিরাকার জ্ঞানের উপরে সাকার প্রতিষ্ঠিত। নিরাকার ভিন্ন সাকারের সত্তা বৃথা। নিরাকার ভিত্তিমূলে সাকার প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরাকার দ্বারা সাকারকে জানি। সাকার জড় জগৎ, এই সাকার দেহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের সত্তা, কে দেখাইয়া দেয়? ঐ নিরাকার জ্ঞান। নিরাকার না থাকিলে সাকার কোথায় পাইতে? তবে কেমন করিয়া বল যে, সাকার ব্যতীত নিরাকারকে জানা যায় না? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উহার বিপরীত যাহা তাহাই সত্য; নিরাকার ব্যতীত সাকারকে জানা যায় না।

যাঁহারা বলেন, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না, তাঁহাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় উক্ত কথাটি যুক্তিযুক্ত কি না। প্রতিমাপূজা করিতে হইলে প্রতিমার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' একান্ত আবশ্যক। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রতিমা পূজা হয় না। কুম্ভকার যখন প্রতিমা নির্মাণ করিল, তখন উহা পূজার পদার্থ নহে। যতক্ষণ না পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা পূজার যোগ্য হয় না। লোকে বিশ্বাস করে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ বিশেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ততক্ষণ উহাতে দেবতার আবির্ভাব হয় না। আবার পূজা শেষ হইয়া গেলে

উহাতে দেবতার আবির্ভাব থাকে না। দেবতা তখন চলিয়া যান। ঐ প্রতিমা তখন আর পূজার যোগ্য থাকে না।

এখন জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে যাহা থাকে না, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবামাত্র যাহা আসে—আবার নিয়মিত পূজার কাল অতীত হইলে বিসর্জনের পর যাহা থাকে না,—সেই পদার্থ,—সেই দেবতাকে, কেহ কি দেখিয়াছেন?

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কি প্রত্যক্ষ করি? প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে যাহা, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর পূজার সময়েও তাহাই, আবার বিসর্জনের পরও তাহাই। এই তিন অবস্থাতেই একই প্রকার দর্শন। অবস্থাভেদে কেহ কিছু বিশেষ দেখিতে পান না। যখন ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন কি কেহ প্রত্যক্ষ করেন যে, দেবতা ঐ মূর্তির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন? আবার যখন বিসর্জনক্রিয়া হয়, তখন কি কেহ প্রত্যক্ষ করেন যে, দেবতা ঐ মূর্তি হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন? এসকল কেহ কখনও দেখিতে পান না। আদি, মধ্য, অন্ত তিন অবস্থাতেই সকলে সমানরূপ দর্শন করেন। প্রতিমাতে দেবতা আবির্ভূত হইলেন, দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন, পূজান্তে দেবতা চলিয়া গেলেন, এই তিনটী ঘটনা কাহারও দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।

এখন সাকারবাদীকে জিজ্ঞাসা করি যে, রূপদর্শন ভিন্ন যদি পূজা না হয়, তাহা হইলে প্রতিমাপূজা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা পাষাণ-নির্ম্মিত যে মূর্তি, তাহারই কি পূজা তুমি করিতেছ? তুমি কি জড়োপাসক? তুমি কি পুত্তলিকার পূজা করিয়া থাক? এ প্রকার প্রশ্নে বুদ্ধিমান্ সাকারবাদী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি বলেন, আমরা জড়ের উপাসনা করি না, পুত্তলিকার উপাসনা

করি না, আমরা মূর্তিপূজক নহি, মূর্তির মধ্যে আবির্ভূত দেবতার পূজা করি। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না, সে কথা কোথায় থাকিল? তুমি কুম্ভকার-নির্মিত প্রতিমূর্তি দেখ;—প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে, বিসর্জনের পরে, কেবল সেই প্রতিমূর্তিই দেখ। তাহাতে যে দেবতার আবির্ভাব হয় তাহা দেখিতে পাও না। আবির্ভাব, তিরোভাব কিছুই দেখিতে পাও না। তবে কেন বল যে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না? তুমি আপনিই বলিতেছ যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় ঐ মূর্তি তোমার পূজার বিষয় নহে। উহাতে যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই তোমার পূজার বিষয়। কিন্তু যাহা আবির্ভূত হয় তাহা কি তোমার প্রত্যক্ষের বিষয়? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে জড় নির্মিত মূর্তির প্রয়োজন থাকিত না। তবে কেন বল, রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না? তোমার চক্ষু যাহা দেখিতেছে, তাহার পূজা করিতেছ না; কখন যাহা দেখিতে পাও না, তাহারই পূজা কর, তবে কেন বল যে রূপদর্শন ভিন্ন পূজা হয় না?

এ কথায় সাকারবাদী বলিবেন যে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না বটে কিন্তু বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক শাস্ত্রীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিলে প্রতিমায় উপাস্য দেবতার আবির্ভাব হয়; বিশ্বাস করি যে, দেবতা পূজার সময় প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন; বিশ্বাস করি যে, উপযুক্ত সময়ে দেবতার তিরোভাব হয়। এ সকলই আমাদের বিশ্বাসের বিষয়। এস্থলে আবার জিজ্ঞাসা করি, উহা যদি সাকারবাদীর বিশ্বাসের বিষয় হয়, তবে রূপদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নিরাকারবাদীর অধিক কি প্রভেদ রহিল? তাঁহারও বিশ্বাস, নিরাকারবাদীরও বিশ্বাস। রূপদর্শন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অধিক কি প্রভেদ রহিল?

এস্থলে সাকারবাদী বলিতে পারেন যে, যদিও আমি আমার

উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না, তথাচ আমার অবলম্বন আছে। প্রতিমা আমার অবলম্বন। প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব আমি বিশ্বাস করি। আমরা প্রতিমার পূজা করি না। পূজার অবলম্বন হইবে বলিয়া প্রতিমূর্তি নির্মাণ করি। নিরাকারবাদীর অবলম্বন কোথায়? বিনা অবলম্বনে কি উপাসনা হয়? শূন্যের উপর কি উপাসনা হয়? নিরাকারবাদীর অবলম্বন কোথায়?

নিরাকারবাদীর কি অবলম্বন নাই? এ কথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড;—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ। ঊর্ধ্বে অসীম গগনে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সকল,—অত্যাশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মপূজার অবলম্বন। নিম্নে সসাগরা ধরণী,—ক্ষুদ্র তৃণকণা হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্যন্ত, ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ পর্যন্ত, ক্ষুদ্রতম বালুকণা হইতে অত্যুঙ্গ হিমালয় পর্যন্ত, সামান্য গোষ্পদ হইতে অকূল মহাসাগর পর্যন্ত, সকল জগৎ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন! সমস্ত প্রাণীর সুন্দর সুকৌশলময় দেহ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন! সকলের উপর মনুষ্যের সুন্দর মনোহর মূর্তি ব্রহ্মপূজার কেমন সুন্দর অবলম্বন! মনুষ্যের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রকাশ যে দেখে নাই, দেখিয়া অবনত মস্তকে কখন প্রণাম করে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠানে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই! এ সকলই তাঁহার পূজার আয়োজন।

এস্থলে সাকারবাদী বলিতে পারেন যে, যদি অবলম্বন স্বীকার করিলে, তবে প্রতিমায় আপত্তি কেন? প্রতিমাপূজা দেশকালবদ্ধ

কল্পিত দেবতার পূজা, সেই জন্যই আপত্তি। অসীম ব্রহ্মাণ্ড পূজার অবলম্বন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রকাশিত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গলভাব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে ;—তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি পদার্থে অধিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। সাধক বিশ্বাসনয়নে তাঁহাকে এই জড় জগতে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

এই জগতে কি জগদীশ্বরকে দেখা যায়? ইহা কি সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যকে কি দেখিতে পাওয়া যায়? মনুষ্য কি চক্ষুগোচর হয়? মনুষ্যকে কি দেখিতে পাও? তাহার হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ সকল অথবা তাহার অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দৈহিক উপাদান ব্যতীত আর কি দেখিতে পাও? কিন্তু হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ বা অস্থি মাংস, শিরা প্রভৃতি শারীরিক উপাদান কি মনুষ্য? এ সকল কি জড় পদার্থ নহে? ঐ সকল যদি জড়পদার্থ হয়, তবে মনুষ্য কি ঐ সকল জড়? মনুষ্য কি, হস্ত পদাদি অঙ্গ অথবা অস্থি, মাংস শিরাদি দৈহিক উপাদান? নিশ্চয়ই না। যদি নিশ্চয়ই তাহা না হইল, তবে মনুষ্য কি?

তোমার পূজনীয়া জননীর কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া বিদেশ হইতে গৃহে আসিলে; আসিয়া দেখিলে তোমার জননীর মৃতদেহ গৃহ-প্রাঙ্গণে শয়ান। তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে; বলিলে 'হায়! মার সঙ্গে দেখা হইল না!' এস্থলে জিজ্ঞাসা করি, কাহার সঙ্গে দেখা হইল না? কি দেখা হইল না? কেন, তুমি পূর্বেও যাহা দেখিতে, এখনও ত তাহাই দেখিতেছ? পূর্বে যে হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকাদি অঙ্গনিচয় দেখিতে, যে জড়দেহ দেখিতে, এখনও ত তাহাই দেখিতেছ? পূর্বে এমন কি দেখিতে পাইতে যাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না? যে শরীর পূর্বে দেখিতে, বর্তমান মুহূর্তেও ত সেই শরীর দেখিতেছ?

তবে বল, পূর্বে এমন কি দেখিতে, যাহা এখন দেখিতেছ না? জড়দেহ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। পূর্বে তুমি যাহা দেখিতে পাইতে, এখনও তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু পূর্বে সেই দেহে যে চৈতন্যপদার্থের আবির্ভাব ছিল, সেই জীবাত্মা এখন আর নাই। সেইজন্যই তুমি বলিতেছ, 'হায়! দেখা হইল না।' তোমার মাতৃদেহে যে জীবাত্মার অধিবাস ছিল, তাহা কি তুমি কখন দেখিয়াছ? জীবাত্মা কি তোমার চক্ষুগোচর হইত? কখনই না। তুমি পূর্বেও তাহা দেখ নাই, এখনও দেখিতে পাইতেছ না। তবে কেন বলিতেছ, 'হায়! দেখা হইল না।' 'দেখা' অর্থ কি? যদি কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ার নামই দেখা হয়, তাহা হইলে তুমি পূর্বে মাতৃশরীরমাত্র দেখিয়াছ, এখনও তাহাই দেখিতেছ; আত্মাকে পূর্বেও দেখ নাই, এখনও দেখিতেছ না। আর যদি 'দেখা' শব্দের অন্য কোন অর্থ থাকে, অর্থাৎ যদি চক্ষু দ্বারা দেখা ব্যতীত অন্যরূপ দেখা থাকে, তাহা হইলে এরূপ হইতে পারে যে, পূর্বে তুমি এমন কিছু দেখিতে, যাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না। যখন তুমি বলিলে 'হায়! দেখা হইল না', তখন 'দেখা' শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছ? চর্মচক্ষে দেখা অর্থে নিশ্চয়ই না। কেন না চর্মচক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহা পূর্বেও যেমন দেখিতে এখনও সেইরূপ দেখিতেছ। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম যদি দেখা হয়, বিশ্বাসনয়নে চৈতন্যপদার্থকে গ্রহণ করার নাম যদি দেখা হয়, তাহা হইলে তুমি পূর্বে সেই মাতৃদেহে যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে তাহাই এখন দেখিতে পাইতেছ না!

এখন দেখ, চক্ষে দেখাই যদি কেবল একমাত্র দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন কাহাকেও দেখিতে পাই না, কেননা চক্ষু কেবল জড়দেহ দেখে। আমাদের পিতা,

মাতা প্রভৃতি কেবল জড়দেহ নহেন। মৃত্যু হইলে কেবল জড়দেহ থাকে। সেই মৃত জড়দেহ দেখিলে তাঁহাদিগকে দেখা হয় না। দেহবাসী জীবাত্মাকে না দেখিলে তাঁহাদিগকে দেখা হয়না। আমরা কেবল চর্মচক্ষে কোন জীবকেই দেখিতে পাই না। আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা কেবল জড় দেহ দেখি। আর আত্মা দ্বারা দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখি। সেই জন্যই মৃত আত্মীয়ের দেহ দেখিয়া লোকে বলে 'দেখা হইল না।' কি দেখা হইল না? চর্মচক্ষে যাহা দেখা যায় না, সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মাকে দেখা হইল না।

এখন সেই পূর্ব প্রশ্ন আবার আসিতেছে,—পরমেশ্বরকে কি দেখা যায়? যেমন মাতা পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজনকে দেখা যায়, পরমেশ্বরকে কি সেইরূপ দেখা যায়? মাতা, পিতা প্রভৃতি সকলকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না, পরম মাতা, পরম পিতাকেও চর্মচক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন, মাতা, পিতা প্রভৃতিকে তাঁহাদের স্থূল দেহের সাহায্যে, তাঁহাদের স্থূল দেহ অবলম্বনে দেখিতে পাই। পরমেশ্বরকে কি অবলম্বনে দেখিব?

এই অদ্ভুত, সুকৌশলময় পরমসুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে। পিতৃ মাতৃদেহে যেমন জীবাত্মা অবস্থিত, সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সেই পরম পিতা, পরম মাতা অবস্থিত। জীবাত্মা যেমন দেহে অবস্থিত, পরমাত্মা সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের অন্তর বাহিরে স্থিতি করেন। জীবাত্মা যেমন দেহকে পরিচালিত করিতেছেন, পরমাত্মা সেইরূপ এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত কার্য করিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতিনিবন্ধন যেরূপ জীবদেহের জীবন, সেইরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের

জীবন। দেহের মধ্য দিয়া যেমন জীবাত্মার জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছা প্রকাশ হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদিয়াও সেইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, ও শক্তি প্রকাশ পায়। জীবিত মনুষ্যের দেহ দেখিলে যেমন একভাবে তাহার আত্মাকে দেখা হয়, প্রকৃতরূপে দেখিতে জানিলে, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও একভাবে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখা হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়।

এখন কেহ বলিতে পারেন, যদি ঈশ্বরপূজার জন্য অবলম্বন প্রয়োজন হইল, তাহা হইলে প্রতিমায় দোষ কি? তোমারও অবলম্বন, আমারও অবলম্বন,—তবে প্রতিমা অবলম্বনে আপত্তি কেন? আপত্তি এই জন্য যে, প্রতিমা মিথ্যা, কল্পিত, আমি সত্য চাই। সত্যই গম্যস্থান, সত্যই পথ। তবে মিথ্যা কল্পনা অবলম্বন করিব কেন?

পরমেশ্বরের কি প্রতিমা আছে? তাঁহার কি প্রতিরূপ সম্ভব? যাহার রূপ আছে, তাহার প্রতিরূপ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যিনি অরূপ, চিন্ময় তাহার প্রতিরূপ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আদৌ যখন তাহার মূর্তি নাই তখন তাঁহার প্রতিমূর্তি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিবে?

এস্থলে সাকারবাদী বলিবেন 'কেমন করিয়া জানিলে যে তাঁহার মূর্তি নাই?' এই সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, তিনি অনন্ত; মূর্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং তাঁহার মূর্তি নাই। একথা সাকারবাদী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মূর্তি বলিলেই পরিমিত বুঝাইবে কেন? অসীম মূর্তি কি অসম্ভব? যাঁহার সীমা নাই, তাঁহার মূর্তিও কি অসীম হইতে পারে না? কখনই না। ত্রিকোণ বৃত্ত, কাঁটালের আমসত্ত্ব, সোণার পাথরবাটী, ও অসীম মূর্তি, এ সকলই সমান সম্ভব। মূর্তি থাকিলেই হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। একটী যেখানে শেষ হইয়াছে, আর একটি সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীর বলিলেই, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবশ্য সীমা থাকিবে। সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্য অসম্ভব কথা। অঙ্গ সকলের সীমা থাকিলেই হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গকে অবশ্য পরিমিত পদার্থ বলিতে হইবে। যাহার প্রত্যেক অংশ পরিমিত, তাহার সমষ্টি অবশ্য পরিমিত। সুতরাং সমগ্র দেহ অবশ্য পরিমিত। যত কেন প্রকাণ্ড হউক না, দেহ মাত্রেই অবশ্য পরিমিত। অসীম দেহ কখন সম্ভব নহে। পরমেশ্বর অনন্ত; সুতরাং তিনি পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন না।

যদি তিনি দেহধারী না হন, তবে তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয় কেন? এই জগৎ কি তাঁহার দেহ নহে? সাকারবাদী এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তদর্শন অবলম্বন পূর্বক এইরূপ বলিতেছেন: 'যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সেই রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চরূপ দেবাদি স্থাবর পর্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্তিমান করিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ; মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি; বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে

মনঃ; সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়; তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু; সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়াছেন?'

রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ; জগৎ রূপ-বিশিষ্ট। যাহা রূপবিশিষ্ট তাহা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের মনের অজ্ঞানতা মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বাস্তব সত্তা নাই; সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মস্বরূপ নহে।

যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাঁহাদিগকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করি: পরমেশ্বর নিত্য, জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার সত্য; জগৎ অসার, অসত্য। পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়; জগৎ অস্থায়ী, চিরপরিবর্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, জগৎ ও ঈশ্বর এক,—তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?

ব্রহ্মশক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি;—ব্রহ্ম স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহার আর জগতের অতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এমন কথা বলিলে তাঁহার নির্বিকার-স্বরূপে আঘাত করা হয়। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বিকারপ্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে, তাঁহার নির্বিকার অপরিবর্তনীয় স্বরূপে দোষস্পর্শ হয়।

কিছু ছিল না; আপনা হইতেই জগৎ হইল, ইহা সম্ভব নহে। কিছুনা হইতে কখন কিছু হয় না। না হইতে হাঁ হয় না। 'নাসতোসজ্জায়তে।' বিনা কারণে কার্য হয় না। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন দর্শন বলেন, মহিষের শৃঙ্গ হয়,—মনুষ্যের হয় না। মহিষদেহে

অবশ্য এরূপ কারণ আছে যাহাতে শৃঙ্গোৎপত্তি হয়; মানবদেহে সেরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, সুতরাং মনুষ্যের শৃঙ্গ হয় না। অসৎ হইতে কখন সৎ হয় না।

এই জগৎ কেমন করিয়া হইল? ইহার কারণরূপী পূর্ববর্তী কি? ব্রহ্মশক্তি। ছিল ব্রহ্মশক্তি, হইল জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়া গেলেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিল না, এইরূপ বলিলে নিত্যকে, অনিত্য, সত্য সার পদার্থকে অসার অস্থায়ী, অপরিবর্তনীয়কে পরিবর্তনশীল, নির্বিকার পূর্ণব্রহ্মকে বিকারপ্রাপ্ত বলা হয়; ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করা হয়।

ব্রহ্মশক্তি জগৎ হইল। পদার্থকে ছাড়িয়া তাহার শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলে, ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলা হয়। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন বলিতে হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়া, শান্তি, পবিত্রতা সকলই তাঁহার সৃষ্টি-লীলায় প্রকাশ হইয়াছে। এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অসার, অনিত্য, পরিবর্তনশীল। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। তবে ব্রহ্মকে জগৎ ও জগৎকে ব্রহ্ম কেমন করিয়া বলা যায়? তিনি জগতের অতীত, নিত্য, সত্য, অপরিবর্তনীয়, অনাদ্যনন্ত পুরুষ। এ জগৎ তাঁহার সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ তাঁহার সাময়িক প্রকাশমাত্র, —তাঁহার সৃষ্টিলীলা। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। অন্তরে সচ্চিদানন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দেখা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দে তাঁহার

প্রকাশ। কিন্তু ঐ সকল অস্থায়ী বহির্বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না। তিনি সচ্চিদানন্দ। প্রহ্লাদচরিত্র-যাত্রায় হাতি দেখিলে, যে ব্যক্তি হাতি সাজিয়াছে তাহাকে দেখা হয় না, তাহার সহিত পরিচয় হয় না। এজগৎ—এই সকল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দও সেইরূপ।

যদিও এমনও কল্পনা করা যায় যে, পরমেশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া উপাসকের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষটি দেখা, আর সেই প্রকাশিত মূর্তি দেখা, একই কথা। ঐ বৃক্ষটি ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মূর্তিও ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট। উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ। ঐ বৃক্ষ নিত্যপদার্থ নহে, সেই মূর্তিও নিত্যপদার্থ নহে। ঐ বৃক্ষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে, সেই মূর্তির স্থায়িত্বও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের সত্তা রহিয়াছে, সেই মূর্তিতেও পরমেশ্বরের সত্তা। সুতরাং ঐ বৃক্ষটি দেখিলে পরমেশ্বরকে যেমন দেখা হয়, যদি তিনি কোন মূর্তি ধরিয়া প্রকাশ হন, সেই মূর্তি দেখিলেও তাঁহাকে সেইরূপ দেখাই হয়! সৎ, চিৎ, আনন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার প্রকৃত দর্শন হয়না। ভক্ত বিশ্বাসী জন স্থাবর জঙ্গমে তাঁহাকে যে ভাবে দর্শন করিতেছেন, তিনি যদি রূপ ধরিয়া আসেন, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হয় না। এ স্থলে আর একটি কথা মনে করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন দিন শূন্যমার্গে শিব কৃষ্ণাদি কোন রূপ দেখিয়া মনে করেন যে তাঁহার ইষ্ট দেবতার দর্শন হইল, তাহা হইলে সে ব্যক্তির যে ভ্রান্তি জন্মে নাই, তাহার কি কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে? উহা যে তাঁহার মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া নহে, অথবা কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তিদ্বারা যে উহা উৎপন্ন নহে, কে ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারে?

পরমেশ্বর চিন্ময়, অরূপ। তিনি অনাদ্যনন্ত মহান। তিনি পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ নহেন। তাঁহার প্রতিমা অসম্ভব। উপনিষদ্ বলিতেছেন,—'ন তস্য প্রতিমা অস্তি,'—তাঁহার প্রতিমা নাই। প্রতিমা অবলম্বনে তাঁহার পূজা, কল্পিত পূজা। সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বর-পূজা এবং প্রতিমা অবলম্বনে পূজা, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কল্পনা ও সত্যে যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যেও তত প্রভেদ।

জড়জগৎ ঈশ্বর-পূজার সাহায্য করে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা, এ উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ। জগৎ ও জগদীশ্বর, এ উভয়ের মধ্যে অতি নিকট, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকরূপে, এই জগৎ জগদীশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—তাঁহার ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া দেয়। এই সুকৌশল-সম্পন্ন, অত্যাশ্চর্য, সৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ড, সেই পরমজ্ঞান, ভূমা, মহান, নিরবদ্য সৌন্দর্যসার, পূর্ণ পুরুষের রচিত। তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলভাব, সমগ্রভাবে সকল ব্রহ্মাণ্ডে, এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থে প্রতি-নিয়ত প্রকাশিত। ক্ষুদ্রতম বালুকাকণা হইতে প্রকাণ্ড অত্যুঙ্গ হিমালয় পর্যন্ত, তৃণকণিকা হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্যন্ত সামান্য কীটাণু হইতে সুবৃহৎ মাতঙ্গ পর্যন্ত, শিশিরকণিকা হইতে অকূল, সুগভীর সাগর পর্যন্ত—নিম্নে এই সসাগরা সকাননা ধরণী হইতে উর্ধ্বে গণনাতীত লোকমণ্ডল পর্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ডপতির নিরুপম মহিমা, অদ্ভুত শক্তি, অপার জ্ঞান, এবং অতুল গভীর করুণা ও প্রেমের অসংখ্য অগণ্য নিদর্শন অহোরাত্র নরচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। কার্য দেখিলেই মানসিক নিয়মানুসারে, তাহার কারণকে স্মরণ হয়। জগৎ দেখিলেই জগৎকর্তাকে স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। জগৎ-কার্যে তাঁহার যে শক্তি, জ্ঞান, ও মঙ্গলভাব প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রতি

ভক্তি ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং জগৎ-কার্য অবলম্বনে পরমেশ্বরের পূজা যারপর নাই সহজ ও স্বাভাবিক।

কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া জগৎ-কার্য অবলম্বনে জগদীশ্বরের পূজা যেমন স্বাভাবিক, একটি পুত্তলিকা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরপূজা কখনই সেরূপ নহে। সৃষ্টি দেখিলেই স্রষ্টাকে মনে হয়, প্রকৃতি দেখিলেই পুরুষকে মনে হয়, ইহা মানবমনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তোমার কোন প্রিয়জনের হস্তরচিত একটী সামগ্রী দেখিলে যেমন সহজে স্বভাবতঃ তাঁহাকে স্মরণ হইবে, কুম্ভকার-নির্মিত একটী মৃণ্ময় মূর্তি দেখিলে সেইরূপ সহজে তাঁহাকে স্মরণ হইবার কি সম্ভাবনা আছে?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, কার্য কারণ সম্বন্ধের ন্যায় সাদৃশ্যও স্মৃতিকে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তির হস্তরচিত কোন সামগ্রী দেখিলে যেমন সেই ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, সেইরূপ তাঁহার একখানি ছবি দেখিলে কি তাঁহাকে স্মরণ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোন পরিচিত ব্যক্তির প্রতিমূর্তি দেখিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্মরণ হয়। কিন্তু সেই অনাদ্যনন্ত মহান পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সেই ইন্দ্রিয়াতীত, অপার, অগম্য, চিন্ময়, আদিকারণের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিবে কে? সে শিল্পী, সে চিত্রকর কোথায়? পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি উপনিষদে যাঁহার বিষয়ে বলিতেছেন :

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ তদনুশিষ্যাৎ
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানিনা; এবং ইহাও জানিনা যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব পূর্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্মবিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্যেরা কহেন, লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি

ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

প্রাচীন মহর্ষিগণ যাঁহাকে অনাদ্যনন্ত ভূমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থে যাঁহাকে উপলব্ধি করার কথা কহিয়াছেন, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিবে কে? মহর্ষিগণ উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি'।

সৃষ্ট পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্রষ্টার উপাসনা, এই আশ্চর্য

সুন্দর জগৎ অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা, যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব বটে, কিন্তু নিরবলম্বভাবে তাঁহার উপাসনা কি সম্ভব নহে? এস্থলে এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎ-কার্যের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, মহাত্মা-দিগের মহৎজীবনের অনুশীলন, নামজপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চ অবস্থায় সম্ভব। সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহির্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ পূর্বক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্মসহবাসসুখে পরিতৃপ্ত হন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।
ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগদ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।
তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণ সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যরাজ্যে প্রবেশ পূর্বক সত্যস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। জড়জগৎ যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাচ তাঁহারা অবিচলিত ভাবে পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন। উচ্চতম অবস্থায় ভিতর বাহির সমান হইয়া যায়। চক্ষু মুদিয়া তিনি, চক্ষু খুলিয়াও তিনি।

এখন কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন ইচ্ছা করিলে মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না কেন? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য

রূপধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? মানিলাম, তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার চৈতন্যময়। কিন্তু যখন তাঁহার শক্তির সীমা নাই, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে সাকাররূপে প্রকাশ হইতে পারিবেন না কেন? অথবা জগতের হিতের জন্য দেশবিশেষে, কালবিশেষে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার পৃথিবীতলে অবতার হইবার অসম্ভাবনা কি?

এই আপত্তির উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কি বলিয়াছেন, দেখুন,—'জগতের সৃষ্ট্যাদিবিষয়ে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান নহেন। এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্তি হইতে পারেন না। যেহেতু সমূর্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক।'

রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বিষয়ে সর্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমন স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেইরূপ তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা বলিলে ব্রহ্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু যাহার নাশের সম্ভাবনা আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান বলিয়া আপনার স্বরূপের বিপর্যয় করিয়া মূর্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিরাকার ব্রহ্ম মূর্তি ধারণ করিলে যে তাঁহার স্বরূপের

বিপর্যয় হয়, তদ্বিষয়ে মহাত্মা রামমোহন রায় বলিতেছেন : 'যখন মূর্তিস্বীকার, কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী হয়েন, কোনমতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।'

সাকারবাদ সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে উহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বা সোপান। পৌত্তলিকতারূপ সোপান অবলম্বন করিয়া উপাসক ক্রমে পরব্রহ্মে উপনীত হন। প্রথমে সাকারপূজা না করিলে,—মূর্তিপূজারূপ উপায় অবলম্বন না করিলে—নিরাকার ব্রহ্মপূজার সামর্থ জন্মে না।

একথা স্বীকার করিতে পারি না। সাকার ও নিরাকার পরস্পর বিপরীত। সুতরাং সাকার উপাসনা অভ্যাস করিলে নিরাকার উপাসনার সামর্থ জন্মে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, মানসিক নিয়মবিরুদ্ধ। অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে কি আলোক দেখিবার শক্তি জন্মে? যত অধিক কাল অন্ধকারে বসিয়া থাকিবে, তোমার চক্ষু ততই আলোক দেখিবার অযোগ্য হইবে। যে সকল বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহার একটীর অভ্যাসদ্বারা অপরটী সম্পন্ন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যায়। সাকার ও নিরাকার পরস্পর বিপরীত। একের অভ্যাসে অন্য বিষয়ের সাধন-শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

সাকারপূজা সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রচলিত প্রতিমাপূজা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে প্রতিমাতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মনে করিয়া তাহার অর্চনা করিয়া থাকে। একথা একভাবে সত্য। সাকারবাদী বা নিরাকারবাদী

সকলেরই লক্ষ্য সেই পরাৎপর পরমপুরুষ। কিন্তু যে ভাবে, যেরূপ বিশ্বাসে, প্রতিমাপূজা, দেবদেবীর পূজা, এদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উহাকে সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা বলিতে পারিনা। প্রচলিত সাকার উপাসনা, দেবদেবীর মূর্তিপূজা, কখনই পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে না।

কাশীর বিশ্বেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত পূর্ণব্রহ্মের সম্বন্ধ কি? ঐ প্রস্তরখণ্ডে অবশ্য পরব্রহ্ম অধিষ্ঠিত,—উহা ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। সেই জন্যই কি উহা পূজনীয়? তাহাই যদি হয়, তবে রাস্তায় যে সকল প্রস্তরখণ্ড পতিত রহিয়াছে, তাহা পূজনীয় হয় না কেন? রাস্তার পাথরে কি পূর্ণব্রহ্মের অধিষ্ঠান নাই? উহা কি ব্রহ্মশক্তির বিকাশ নহে? তবে বিশ্বেশ্বর যেমন পূজনীয়, রাস্তার প্রস্তর তেমনি হয় না কেন? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া প্রস্তরাদি নির্মিত মূর্তি পূজিত হয়, এরূপ নহে। অন্য কোনরূপ বিশ্বাস উহার মূলে আছে।

সাকারবাদীগণ যে দেবমূর্তির পূজা করিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আহার করে, নিদ্রা যায়, শয্যায় শয়ন করে, এমন কি, মশক দংশনের কষ্ট নিবারণের জন্য উহার মশারি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থলে মনুষ্যের ন্যায় ঠাকুরে জ্বর ও শিরঃ-পীড়া হইয়া থাকে। ইহাই কি পূর্ণ পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা?

প্রচলিত পৌত্তলিকতাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এ সকল কথা বলিলাম না। যাঁহারা বলেন যে, প্রচলিত পৌত্তলিকতা পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা,—উহা ব্রহ্মোপাসনার আকার ভেদ বা নামভেদ মাত্র, তাঁহাদের কথার অযৌক্তিকতা ও অসারত্ব প্রদর্শন করিবার জন্যই

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হইল। উহা বিদ্রূপ নহে, যুক্তি। যাঁহারা বলেন, প্রচলিত মূর্তিপূজা পরমেশ্বরেরই উপাসনা, মূর্তি কেবল অবলম্বনমাত্র, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্যই উহা বলা হইয়াছে। উক্ত প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। তারকেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ শিবের পূজা, যে ভাবে ও যেরূপ বিশ্বাসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে উহাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা বলা কি সঙ্গত? শিবমূর্তিতে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের শক্তি অনুভব করিয়া লোকে উহার পূজা করে, ইহাই কি প্রকৃত কথা?

প্রচলিত সাকারবাদ যে পরিমিত কল্পিত দেবদেবীর পূজা, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বাঙ্গালীজাতির সর্বপ্রধান উৎসব, দুর্গোৎসবের বিষয় আলোচনা কর। দুর্গোৎসব সম্বন্ধে সর্বসাধারণ বঙ্গবাসীর বিশ্বাস কিরূপ? মা ভগবতী সম্বৎসর কাল পতিপুত্র লইয়া কৈলাসে বাস করেন। বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য বাঙ্গালী ভক্তের গৃহে আসিয়া থাকেন। সে জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদ্বারা উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণাদিপূর্বক তাঁহাকে সপরিবারে আহ্বান করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে আবার তিনি এক বৎসরের জন্য চলিয়া যান। তখন বিসর্জন করিতে হয়। ইহাই কি সর্বব্যাপী, সর্বগত, সৎস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা? ইহাই কি সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের সত্তা প্রতিমায় অনুভব করিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া? বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পুরোহিত প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে সাকারবাদী বিশ্বাস করেন যে উহাতে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে। আবার বিসর্জনের পর মনে করেন যে, দেবতা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে দেবতা প্রতিমায় ছিলেন না, বিসর্জনের পরে প্রতিমায় থাকেন না। উহাই সর্বসাধারণের বিশ্বাস।

ইহাই কি সর্বব্যাপী, সর্বগত, বিশ্বের প্রাণ, অন্তরাত্মা পরমাত্মার উপাসনা?

এদেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা কেবল মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা নহে। আশ্চর্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক, পদার্থ সকলের পূজাও তাহার অন্তর্গত। চন্দ্রসূর্য, নদী, পর্বত, বৃক্ষ লতা, পশু, পক্ষী সকলই এই পূজার অন্তর্গত। তেজঃপুঞ্জ দিবাকর, সাকারবাদীর পূজনীয়। 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরং,'—'জবাকুসুমের ন্যায় বর্ণ, কশ্যপের পুত্র মহাজ্যোতি-বিশিষ্ট, অন্ধকার-বিনাশক, সকল পাপবিনাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি'—সূর্যের এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাকারবাদী কেমন ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করেন! ইহাই কি সর্বব্যাপী, সর্বগত, পরব্রহ্মের উপাসনা! সূর্যের ন্যায় চন্দ্রও একটী বিশেষ দেবতা। সাধারণ বিশ্বাসানুসারে তাঁহার রোহিণী প্রভৃতি অনেকগুলি স্ত্রী আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহার সহিত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের কোনও সম্বন্ধ নাই।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান বিনাশ করিতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়া ছাত্র উপযুক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র করিলেন, অমনি জল উৎপন্ন হইল। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ছাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, জল মূলভূত নহে। কেবল তাহাই নহে; সঙ্গে সঙ্গে জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণ দেবতাও চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি নিজে জল সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার কি আর জলের কর্তা বরুণ দেবতায় বিশ্বাস থাকা সম্ভব? বিশেষ পরিমাণ নাইট্রোজেন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজেন একত্র করিলে বায়ুর উৎপত্তি হইল। অমনি পবনদেব চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। সূর্য যে জড়পিণ্ড

মাত্র, বিশেষ কোন দেবতা নহে, বিজ্ঞান ইহা প্রকাশ করিতেছে। সূর্য কি কি পদার্থে নির্মিত (composition of the sun), পণ্ডিতেরা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্ধারণ করিতেছেন।

অজ্ঞান ও মূর্খতা হইতেই সর্বপ্রকার কুসংস্কারের উৎপত্তি। শিশু ঘড়ি দেখিলে উহাকে জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করে। ঘড়ি যে একটী কল, প্রাকৃতিক শক্তিতে চলিতেছে, ইহা সে বুঝিতে পারে না। সে উহাতে জীবন ও জ্ঞান দেখিতে পায়। উহাকে যন্ত্রমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এদেশে যখন প্রথম (East Indian) ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলের গাড়ী চলিয়াছিল, তখন মাঠের চাষীরা দেবতাজ্ঞানে উহাকে প্রণাম করিয়াছিল! পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ে খোলা হইলে পরেও তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। কৃষ্ণনগরের নিকট দোগেছে গ্রামে একটী অদ্ভুত, বিশেষ প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট শাল্মলীবৃক্ষ আছে। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ উহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

যে কারণে শিশু ঘড়িকে প্রাণ ও জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে, যে কারণে রেলের গাড়ী দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছিল, যে কারণে দোগেছের শিমুলগাছ দেবতা হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছে, সেই কারণেই প্রকৃতি-রাজ্যে বহুপ্রকার আশ্চর্য, ভয়ঙ্কর, সুন্দর ও উপকারী পদার্থ দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ঐ সকল যে প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা চলিতেছে, ইহা অজ্ঞান অবোধ লোক বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারা সহজ নহে। উহা বহুকালের জ্ঞানোন্নতির ফল। অকূল ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র যে জলরাশি মাত্র, অভ্রভেদী হিমাচল যে জড়পিণ্ড মাত্র, সাগরগামিনী পরমহিতকারিণী নয়নানন্দদায়িনী ভাগীরথী যে জলস্রোত মাত্র, গগনবিহারিণী বিশ্ব-উজ্জলকারিণী মহাশক্তিশালিনী সৌদামিনী যে জড়শক্তি মাত্র, ইহা

বুঝিতে পারা বহুযুগ ও বংশব্যাপী জ্ঞানোন্নতিসাপেক্ষ। এই সকলকে জড়ীয় শক্তি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যুগ যুগান্তরের জ্ঞানচর্চার ফল। এখন শিক্ষিত লোকের নিকট যাহা সহজবোধ্য, আদিম মনুষ্যের নিকট তাহা কখনই সেরূপ ছিলনা। বর্তমান সময়েও পৃথিবীর অজ্ঞান মূর্খলোকের অবস্থা কতক পরিমাণে আদিম মনুষ্যের সদৃশ।

আমাদের দেশের অনেক লোক মনে করেন যে, সামান্য মূর্খ লোক ধর্মহীন হইয়া থাকিবে বলিয়া প্রাচীন মহর্ষিগণ পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসকলে যে সকল অসভ্য জাতি বাস করিতেছে, তাহাদের ধর্ম আছে; তাহারাও দেব দেবীর পূজা করে। ঋষিরা কি তাহাদিগকেও পৌত্তলিকতা শিখাইতে গিয়াছিলেন? অজ্ঞান লোকে দোগেছের শাল্মলী বৃক্ষ পূজা করিতেছে। ঋষিরা কি উহা শিখাইতে আসিয়াছিলেন?

এই প্রকার পৌত্তলিকতা ভিন্ন, অন্যরূপ পৌত্তলিকতা আছে যথা, তান্ত্রিক মূর্তিপূজা। ঐ সকল নিশ্চয় রূপক। কালীমূর্তি, দশভূজা মূর্তি রূপক বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। দশ হস্ত,—আদ্যাশক্তি দশদিক রক্ষা করিতেছেন। ত্রিনেত্রা,—তিন কাল দেখিতেছেন। সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী,—মহা পরাক্রমে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, ও গণপতি সঙ্গে, অর্থাৎ আদ্যাশক্তি ধন, বিদ্যা, জয় ও সিদ্ধিদায়িনী। এইরূপ তান্ত্রিক মূর্তি-পূজার অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সে ভাবে ঐ সকলের অর্চনা করে না। লোকের নিকটে ঐ সকল, বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ দেবতা।

কেবল তাহাই নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার

দেবতাকে সকলের আদি ও সকলের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব জানেন, বিষ্ণু সকলের আদি। তাঁহা হইতে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা, বিষ্ণুর অধীন ও আজ্ঞাকারী। শৈব বিশ্বাস করেন যে, শিব সকলের আদি। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা শিবের অধীন ও আজ্ঞাকারী। শাক্ত মনে করেন, শক্তি সকলের মূল। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই শক্তি হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি সকল দেবতাই শক্তির অধীন ও আজ্ঞাকারী।

হিন্দুসম্প্রদায়সকলের মধ্যে এই গুরুতর মত-বিরোধ বর্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে যে বিরোধ দেখিতেছি, শাস্ত্রে সেই বিরোধ। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিষ্ণুই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। শৈবশাস্ত্রে শিবই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। শাক্তশাস্ত্রে শক্তিই প্রধান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন।

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণে, বিষ্ণু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অন্য কোন খণ্ডে দুর্গা ও গণেশ পরমেশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিবপুরাণে মহাদেব সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দুর্গা পরমেশ্বরীরূপে বর্ণিত। পুরাণ সকলের মধ্যে এইরূপ অনৈক্য।

ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্বেষামীশ্বরশ্চৈক এব সঃ।
সর্বেষাং পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ॥

ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশশ্চ মহাবিরাট্।
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্রস্তস্যাংশা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
পদ্মনাভের্নাভিপদ্মান্নিঃসসার পুমান্ মুনে।
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাং বরঃ।
চতুর্মুখস্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব হ।
বামার্ধাঙ্গে মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটীরবিপ্রভঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্মাম্বরো হরঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, প্রকৃতিখণ্ডে, নারায়ণ-নারদ সংবাদে, দ্বিতীয় ও সপ্তম অধ্যায়ে, মহর্ষি নারদ সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া নারায়ণের নিকট প্রশ্ন করিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে বলিতেছেন: হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের পরমাত্মা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহাবিরাট ও ক্ষুদ্র বিরাট সকলেই তাঁহার অংশসম্ভূত এবং প্রকৃতিও তাঁহার অংশ মধ্যে পরিগণিতা। পদ্মনাভ নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে কমণ্ডলুধারী, তপস্বী, জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ চতুর্মুখ ও শ্রীমান এক পুরুষ নিঃসৃত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ উক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মতেজের দ্বারা প্রকাশমান থাকিয়া সেই আদিকারণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। বামভাগের অর্ধ অঙ্গে মহাদেব এবং দক্ষিণ ভাগে গোপিকাপতি মূর্তি ধারণ করিলেন। বামভাগে যিনি উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার মূর্তি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্মল, তাঁহার প্রভা শতকোটি

সূর্যসঙ্কাশ, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পটিশ, তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, এবং তাঁহার নাম হর।

সৃষ্টিপালনসংহারশক্তয়স্ত্রিবিধাশ্চ যাঃ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানাং সা ত্বমেব নমোঽস্তু তে॥

... ...

যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিস্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
যদাজ্ঞয়া চ কালশ্চ শশ্বদ্ ভ্রমতি বেগতঃ।
মৃত্যুশ্চরতি জন্তোঘে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ পাতি পাতা যদাজ্ঞয়া।
সংহর্তা সংহরেৎ কালে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গণপতিখণ্ডে ৪৬ অ।

পরশুরাম গণেশের দন্তভগ্ন করাতে তাঁহার প্রতি ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া নারায়ণের পরামর্শে তিনি এইরূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন: হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন জন যে সৃষ্টি স্থিতি সংহার, এই ত্রিবিধ শক্তি ধারণ করেন, তুমি সেই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। যাঁহার আজ্ঞানুসারে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ এবং অগ্নি দহন করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে কাল নিয়ত বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং মৃত্যু জীবগণের উপরি নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি। যাঁহার আজ্ঞার অনুগত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু জগৎ পালন করিতেছেন, এবং সংহারকর্তা মহেশ্বর যথাকালে বিশ্বসংহার করিতেছেন, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি।

সর্বশক্তিস্বরূপেয়মনয়া শক্তিমজ্জগৎ।
অনয়া শক্তিমান্ কৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ!
সৃষ্টিং কর্তুমশক্তশ্চ বিনা শক্ত্যানয়া বিনা।
বয়মস্যাঃ প্রসূতাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥
সুরসংঘেঽসুরগ্রস্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ।
তেজঃসু সর্বদেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, গণপতিখণ্ডে, ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে, পরশুরামের প্রতি বিষ্ণুবাক্য।

হে দ্বিজ! এই দেবী সর্বশক্তিস্বরূপা। ইহার দ্বারা সমস্ত জগৎ শক্তিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ নির্গুণ কৃষ্ণ ইহাদ্বারা শক্তিমান্। সুতরাং এই শক্তি ব্যতিরেকে তিনি সৃষ্টিকার্যে সমর্থ নহেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমরা ইহা হইতেই প্রসূত হইয়াছি। পূর্বে কোন ঘোরতর সময়ে দেবগণ অসুরদিগের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হইলে সমস্ত দেবতার তেজোরাশিতে এই সতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অংশে সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যে একদা ব্রহ্মার ক্রোধ হইলে, তাঁহার ললাটদেশ হইতে রুদ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে, সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভ বধ প্রস্তাবে, ব্রহ্মা ভগবতীকে এইরূপে স্তব করিতেছেন: "সংসার পালনে বিষ্ণু, সৃষ্টিকার্যে আমি, সৃষ্টি-সংহারে মহাদেব, আমরা এই তিনজন এই তিন কার্যের নিমিত্ত তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি", ইত্যাদি। আবার শিবপুরাণে আছে, যে মহাদেব, ব্রহ্মা, এবং বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্তা।

অথাস্য দক্ষাংশত ঈশ্বরস্য
যজ্ঞে জগৎসৃষ্টিকরোঽজজন্মা।

বামাঙ্গতো বিষ্ণুরভূদ্ধিদাত্মা।
নীলোহপি রুদ্রো হৃয়াৎ তু হর্তা॥

মহেশ্বর স্থষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার দক্ষিণ অংশ হইতে জগৎস্থষ্টিকর্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বামাঙ্গ হইতে বিশ্বসংসারের হিতকারক বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর রুদ্রদেব নিজ হৃদয় হইতে স্বস্বরূপে নীললোহিত নামে সংহারকর্তৃত্বে প্রকাশিত হইলেন। শিবপুরাণে আছে যে, মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে স্থষ্টিকার্যের ও বিষ্ণুকে পালনকার্যের ভার দিয়াছিলেন, যথা:

ভো! রক্তাঙ্গ! ব্রহ্মরূপী ভবাশু,
জগৎসর্বং রজসা ত্বং স্থজস্ব!
অসৌ কৃষ্ণঃ পাতু এতত্তু সর্বং
ত্রিভিগুণৈশ্চাচ্ছাদিতোহহং স্বশক্ত্যা।

হে রক্তাঙ্গ! তুমি অচিরাৎ ব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্বক রজোগুণদ্বারা সমস্ত জগৎ স্থজন কর; এবং এই কৃষ্ণ সমুদায় বিশ্বমণ্ডল রক্ষা করুন। আর আমি নিজ শক্তি বলে সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলাম। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের আজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন; এবং নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

'সংপূজ্যৈনং সর্বভূতান্তরস্থং
ব্রহ্মাহ্যভৌ কৃতকৃত্যৌ তু ভূত্বা।
পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরেষঃ
তত্তদ্বাক্যং পালয়ামাস সর্বম্।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সর্বভূতের অন্তরস্থ এই মহাদেবকে পূজা করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। পরে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক মহেশ্বরের সেই সমস্ত বাক্য যথানিয়মে পালন করিয়াছিলেন!

যাঁহারা বলেন, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি পরমেশ্বরের বিভিন্ন নামরূপমাত্র,—সকল দেবতাই এক, যিনি বিষ্ণু, তিনি শিব ইত্যাদি, পুরাণ পাঠ করিলে তাঁহাদের কথা অশাস্ত্রীয় ও অমূলক বলিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন পুরাণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের স্থষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর অধীন; আবার কোন পুরাণে শিব, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মার স্থষ্টিকর্তা; বিষ্ণু ও ব্রহ্মা শিবের অধীন; এরূপস্থলে কেমন করিয়া বলিব যে সকলই এক, কেবল পরমেশ্বরের নামরূপের প্রভেদ-মাত্র। শাস্ত্রের কোনস্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহাশক্তি ভগবতী হইতে প্রসূত হইলেন। আবার কোথাও বা বর্ণিত হইতেছে যে, সমুদায় দেবতার তেজোরাশিতে ভগবতীর উৎপত্তি।

সুরসংঘেহসুরগ্রস্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ।
তেজঃসু সর্বদেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী॥
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, গণপতিখণ্ডে, ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে, পরশুরামের প্রতি বিষ্ণুবাক্য।

সমুদায় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, অল্পবুদ্ধি মূর্খ লোকের চিত্তের স্থৈর্যের জন্য বিবিধ দেবীমূর্তি কল্পিত হইয়াছে।

নির্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দা স্তেহনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥

যে সকল মন্দবুদ্ধি মানব নির্গুণ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ নহে, সবিশেষ কল্পনাদ্বারা সেই সমস্ত মূঢ়গণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবগণ জন্ম মৃত্যুর অধীন, ইহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ কুলার্ণব ১ম উল্লাস।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত জীব কেবল বিনাশের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, অতএব সকলেই শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে।

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

সলিল সকল যেমন বাড়বানলের পশ্চাৎ ধাবমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য প্রাণিগণ, বিনাশেরই অনুধাবন করিতেছে।

অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥ কুলার্ণব ৯ম উল্লাস।

ব্রাহ্মণগণের দেবতা অগ্নিতে, মনস্বীগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের দেবতা প্রতিমাতে, আর যাহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের দেবতা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এক্ষণে অনেকে প্রচলিত পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা। লোককে খোসা ও শাঁসের প্রভেদ দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথম ব্রাহ্মসমাজ হইতেই আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় দ্বারা যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদিত হইত, তখন তিনি উহাতে অনেকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তৎপর স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন হিন্দুদেবদেবীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া অনেকগুলি উপদেশ প্রদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন অন্য লোকে এক্ষণে তাহারই অনুবর্তী হইয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এক্ষণে কোন কোন পুনরুত্থানকারী পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহাতে পরিণামে পৌত্তলিকতার বিনাশ। লোকে খোসা ফেলিয়া শাঁস লইতে শিক্ষা করিবে।

পৌত্তলিকতা সমর্থন করিবার জন্য কেহ কেহ বলেন যে, অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব। অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না। সুতরাং দেবদেবীর উপাসনা একান্ত প্রয়োজনীয়। অনন্তের জ্ঞান কি বাস্তবিক অসম্ভব? অসম্ভব হইলে ভাষায় 'অনন্ত' শব্দ কেমন করিয়া আসিল? মানুষের মনের ভাব শব্দের দ্বারা প্রকাশ হয়। ভাষায় যখন 'অনন্ত' শব্দ রহিয়াছে, তখন অনন্তের ভাব বা জ্ঞান মনুষ্যের মনে অবশ্যই আছে। মনুষ্যের মনে অনন্তের জ্ঞান না থাকিলে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই অনন্তবোধক শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? যিনি বলেন, অনন্তকে বুঝি না, তাঁহার কথার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। অনন্ত ব্রহ্মকে বুঝি না বলিলে কি বুঝায়? তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে এমন কিছু বুঝিয়াছি যাহাতে বুঝিতেছি যে, তাঁহার বিষয় বুঝি না। যে পদার্থকে একেবারেই জানি না, তাহা বুঝি বা না বুঝি, এ দুইয়ের কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যখন বলিতেছি যে, অনন্তকে বুঝি না তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইতেছে যে, অনন্তের বিষয়ে এমন কিছু বুঝি বা জানি, যদ্দ্বারা ইহা বুঝিতেছি যে, অনন্তকে বুঝি না।

পরিমিত কাহাকে বলে, সকলেই বুঝে। কিন্তু অনন্ত কাহাকে বলে? অনন্তের লক্ষণ কি? যাহা পরিমিত অপেক্ষা বড়, এই বাক্যে কি ভাব, কি জ্ঞান, প্রকাশ করে, তাহা অবশ্যই আমরা বুঝি।

পরিমিতকে জানিলেই অনন্তকে জানা হয়। অপেক্ষিক জ্ঞান পরস্পরকে প্রকাশ করে। ভাল, মন্দ, হ্রস্ব, দীর্ঘ পিতা, মাতা, সন্তান, পাপ, পুণ্য, ইত্যাদি জ্ঞান পরস্পর আপেক্ষিক। যে ভালকেও জানে,

সে মন্দকেও জানে ; যে মন্দকে জানে, সে ভালকেও জানে। যে হ্রস্ব কি জানে, সে দীর্ঘ কি, তাহাও জানে। পিতা মাতা বলিলেই সন্তান বুঝায় ; সন্তান বলিলেই পিতা মাতা বুঝায়। পাপ বলিলেই পুণ্য বুঝায়, পুণ্য বলিলেই পাপ বুঝায় সেইরূপ পরিমিত বলিলেই অনন্ত বুঝায়, অনন্ত বলিলেই পরিমিত বুঝায়। যাহার পরিমিতের জ্ঞান আছে, তাহার অনন্তের জ্ঞানও আছে। অনন্তকে না জানিলে পরিমিতকেও জানা যায় না। দার্শনিকেরা বলেন, আপেক্ষিক জ্ঞান, ভিন্ন হইলেও, বাস্তবিক একই জ্ঞান।

তবে অনন্তকে বুঝি না, এ কথার কি কোন অর্থ নাই ? ইহার অর্থ এই যে, আমাদের পরিমিত মনে ধারণা হয় না। অনন্তকে অনন্ত বলিয়া বুঝিতে পারি ; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আয়ত্ব করিতে পারি না। উহা apprehend করিতে পারি, কিন্তু comprehend করিতে পারি না। অনন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ হয় ; কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে উহা ধারণা করিতে পারি না।

কেবল অনন্ত বলিয়া কেন, পরিমিত পদার্থসকলেরই কি আমাদের ধারণা হয় ? ঐ বৃক্ষটিকে সমগ্রভাবে আমাদের মন কি ধারণ করিতে পারে ? বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, ফল, যাহা কিছু বৃক্ষে আছে,—উহার সমুদায় অংশ এককালে কি আমাদের ক্ষুদ্র মন ধারণ করিতে পারে ? কখনই না। এই গৃহটিকে ভাবিতে গিয়া, ইহার প্রত্যেক অংশ কি এককালে ভাবিতে পারি ? এক অংশ ভাবিতে গেলে অপর অংশ মন হইতে সরিয়া যায়। সমগ্রভাবে ঐ বৃক্ষটিকে কিম্বা ঐ গৃহটীকে ভাবিতে গেলে কখনই উহাদের সুস্পষ্ট ধারণা হয় না! ইয়োরোপীয় দার্শনিক এইরূপ জ্ঞানকে symbolic conception বলেন। যে পরিমাণে পদার্থ বৃহৎ হইবে, সেই পরিমাণে

তাহার ধারণা অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। হিমালয় পর্বত কত বড় কেহ মনে ধারণ করিতে পারেন ? পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির পরিমাণ জানিলেই কি পৃথিবী কত বড়, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হয় ? ঘরের বাহিরের রৌদ্র রহিয়াছে জানি ; কিন্তু রৌদ্র কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার কি ধারণা হয় ? ধারণা না হইলেও ইহা সুস্পষ্ট জানি ও বুঝি যে রৌদ্র রহিয়াছে।

সেই অনন্ত পুরুষকে মনুষ্য ধরিতে পারে না ; অথচ সাধক তাঁহাকে ধরিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করেন। একটী কলসে মহাসমুদ্র হইতে জল তুলিলাম। মহাসমুদ্র কলসের মধ্যে আসিতে পারে না। কিন্তু কলসের যতটুকু আয়তন, সেই পরিমাণে সমুদ্রের জল উহাতে অবশ্যই ধরিবে। পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন তাহাতে কি ? আমার হৃদয় যতটুকু সেই পরিমাণে তাঁহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। আমার হৃদয়-কলসের যেরূপ আয়তন, অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্য প্রবিষ্ট হইবে। কিন্তু হৃদয়-কলসের এমনই প্রকৃতি যে উহা ক্রমেই বড় হইতে থাকে। যতই বড় হয়, ব্রহ্মসাগরের জল ততই অধিক পরিমাণে উহাতে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে ধরিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে ছোট করিও না ; আপনাকে বড় কর। তোমার হৃদয় মন আত্মাকে প্রশস্ত কর। যতই তোমার হৃদয় মন ও আত্মা প্রশস্ত হইবে, ততই অনন্তকাল পর্যন্ত সেই অনন্তপুরুষকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে ধারণ করিতে পারিবে। পিতা মহৎ লোক। পুত্র তাহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে পিতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়া কি সে একজন সামান্য ব্যক্তিকে পিতা বলিবে ? মহাপণ্ডিতের মূর্খ পুত্র পিতার বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় কিছু বুঝে না বলিয়া কি একজন মূর্খকে পিতা বলিবে ? ক্ষুদ্র অবোধ শিশুর পিতা, মহা জ্ঞানী, মহা ক্ষমতাশালী ;

পিতার জ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয় শিশু কিছুই বুঝে না। না বুঝিল তাহাতে কি? সে পিতার চরণতলে বসিতে পারে; সরল নির্মল প্রেমে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পারে।

পরমেশ্বরকে বুঝি না বলিয়াই তিনি আমাদের উপাস্য। যাহাকে বুঝিয়া লইয়াছি, তাহাকে গ্রাহ্য করে কে? তাঁহাকে কেহ বুঝে না, জানে না। সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন, হার মানিয়াছে। সেই জন্যই জগৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে। সেই জন্যই তিনি আমাদের উপাস্য। ক্ষুদ্র, পরিমিত, কখন উপাস্য হইতে পারে না।

পৌত্তলিকতা সমর্থন করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন যে মূর্তি চিহ্নমাত্র। মূর্তি পূজার্হ নহে। মূর্তি দেখিলে পরমেশ্বরের স্মরণ হয়, সেই জন্য মূর্তির প্রয়োজন। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ঐরূপ ভাবে মূর্তির ব্যবহার করে না; চিহ্ন বলিয়া মূর্তি আদৃত নহে। ঐ রূপ ভাবে যে মূর্তির ব্যবহার করা হয় না তাহা সকলেই জানেন। পূর্বে তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা দেবমূর্তিকে চিহ্নমাত্র মনে করিয়া পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা 'ক' বর্ণের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, শব্দের বাস্তবিক আকার নাই; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার জন্য, আমাদের প্রয়োজনের জন্য, ক, খ, প্রভৃতি বর্ণের আকার কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগে শব্দ না আগে আকার? অবশ্য অগ্রে শব্দ। 'ক' শব্দ আগে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাহার পর তাহার আকার দেখাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং এ যুক্তিতে সাকার হইতে নিরাকারে যাওয়া যায়, এরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে না। নিরাকারের জ্ঞান পূর্বে রহিয়াছে, পরে তাহার আকার দেওয়া হইতেছে।

ক, খ, প্রভৃতি বর্ণ সম্বন্ধে আর একটী কথা এই যে, যদি কেহ এরূপ কল্পনা করেন যে 'ক' বর্ণের দশ হাত, তিন চক্ষু, তিনি এক দেবতা; যদি বলেন যে, এই দশ হাত, তিন চক্ষু বিশিষ্ট 'ক' দেবতার পূজ কর। তাহা হইলে উহা পৌত্তলিকতা হইল। নতুবা প্রয়োজনের জন্য শব্দের রূপ কল্পনায় উপকার ভিন্ন কোন অনিষ্ট নাই।

অনেক প্রাকৃতিক পদার্থ ও ঘটনার মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। সূর্য, চন্দ্র, গঙ্গানদীর মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মনসার মূর্তি, বসন্তের দেবতা শীতলার মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। আবার নূতন প্রকার রোগের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নূতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও কল্পিত হইয়াছে। ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বেদ-পুরাণ ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ ওলাবিবি! যাহারা বলেন, দেবমূর্তি ঈশ্বরের চিহ্ন বা প্রতিনিধিস্বরূপ (substitute) তাঁহাদের কথার উত্তরে কবি রবীন্দ্রনাথ একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন! ইংলণ্ডের রাজা আর্থারের (King Arthur) সহিত ভিন্নদেশীয় এক রাজকুমারীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। কন্যা দেখিবার জন্য রাজা নিজে না গিয়া তাঁহার একজন সভাসদকে প্রেরণ করিলেন। সভাসদ অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকেই রাজা বলিয়া বিবাহার্থিনী কন্যার ভ্রান্তি জন্মিল, এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন; সুতরাং আর্থারের সহিত তাঁহার বিবাহ দুর্ঘট হইল। পৌত্তলিকতা সেইরূপ। পুত্তলিকা যদি চিহ্ন বা প্রতিনিধি হয় তবে উহা রাজা আর্থারের প্রেরিত প্রতিনিধির ন্যায়। লোকে উহাকে চিহ্ন বা প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেছে না। উহাকেই উপাস্য দেবতা জানিয়া হৃদয়ের প্রেম, ভক্তি, সকলেই উহার চরণে সমর্পণ করিতেছে। ইহা নিশ্চয় যে, প্রতিমাকে লোকে বিশ্বকর্তা, বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের

চিহ্নস্বরূপ মনে করে না। তবে বলিতে পারেন যে, কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। যে দেবতার যেমন আকার, কাষ্ঠমৃত্তিকাদিতে তাঁহার সেইরূপ মূর্তি গঠিত হয়। দেবতা আসিয়া তাহাতে আবির্ভূত হন। এইরূপ বলিলে সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেকটা প্রকৃত কথা বলা হয়। তথাচ ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, অবোধ লোকে প্রতিমা ও প্রতিমাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে একীভূত করিয়া ফেলে। তাঁহাদের নিকটে মূর্তি ও দেবতা এক। দেহ এবং আত্মা ভিন্ন হইলেও অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষের দেহাত্মবুদ্ধি হয়। দেহে আত্মজ্ঞান অনেক পরিমাণে অজ্ঞানীর পক্ষে স্বাভাবিক। সেইরূপ, দেহাত্মবুদ্ধির ন্যায় অবোধ লোকের নিকটে পুত্তলিকা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক হইয়া যায়। সেই জন্য বিগ্রহকে শয্যায় শয়ন করাইয়া পৌত্তলিক মনে করেন দেবতা শয়ন করিলেন; সেইজন্য দেব-বিগ্রহকে মশক দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মশারি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়; সেইজন্য দেবতার আরামের জন্য তাঁহাকে তালবৃন্ত বা চামর ব্যজন করা হয়। বিশেষ সময়ে মাহেশ ও পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের জ্বর হয়, শিরঃপীড়া হয়, পাণ্ডাগণ কাপড় দিয়া মস্তক বাঁধিয়া দেন, জ্বর ভাল হইলে জগন্নাথ দেব পথ্য করেন। বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে যাহাই হউক না কেন, অবোধ, অশিক্ষিত সাধারণ লোকে ঐ সকলে বিশ্বাস করে। তবে সময়ের গুণে সাধারণ লোকের মধ্যেও উক্ত রূপ বিশ্বাস দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। নিরাকারবাদীরা পৌত্তলিক শব্দ ব্যবহার করেন বলিয়া যে সকল হিন্দু রাগ করিয়া থাকেন, এই বিষয়টা তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। কাষ্ঠাদিনির্মিত জড় মূর্তিতে অজ্ঞান, অবোধ সাধারণ লোকে দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে, ইহা দেশের সর্বত্র দৃষ্ট হয়; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

কেহ কেহ বলেন যে, পুত্তলিকা বা দেবদেবীর পূজার দোষ কি? আত্মার তৃপ্তি হইলেই হইল। দেবদেবীর উপাসনাতে যখন আত্মার তৃপ্তি হইয়া থাকে তখন উহাতে আপত্তি কর কেন? নদীর জল বা হ্রদের জল বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল পান কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তৃষ্ণা নিবারণ হইলেই হইল। 'আত্মার পেট' ভরিলেই হইল। কিন্তু পৌত্তলিকতা কি আত্মার পেট ভরাইতে পারে? পেট কি? অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানপিপাসা কি পৌত্তলিকতাদ্বারা পূর্ণ হইতেছে? পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত কি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য হয়? দুইপাত ইংরাজি পুস্তক বা ইংরাজির অনুকরণে লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিলেই, বালকের হৃদয় হইতে প্রচলিত অমূলক সংস্কার সকল তিরোহিত হইতে থাকে। ভূগোলসূত্রের প্রথম পৃষ্ঠা পড়িয়াই জানিতে পারে যে, পৃথিবী বাসুকির মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে না। উহা শূন্যমার্গে সূর্যের চতুর্দিকে নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। ভূগোলসূত্র পৌরাণিক বাসুকিকে বালকের হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে। সামান্য ভূবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্র বুঝিতে পারে যে, বাসুকির মস্তক সঞ্চালন ভূমিকম্পের কারণ নহে। পদার্থবিদ্যা, পবন, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে, ভৌতিক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতেছে। জ্যোতিষের সামান্য জ্ঞান, চন্দ্র সূর্যাদি গগনবিহারী দেবগণকে অধিকারচ্যুত করিতেছে। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রহণ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যায়িকা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে? এই সকল সংস্কার অতি সামান্য জ্ঞানচর্চাতেই বিনষ্ট হইতেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক যতই বিস্তৃত হইতেছে, ততই পৌত্তলিকতা নব্যসম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে লোকের হৃদয় হইতে দেবতা সকল সিংহাসনচ্যুত হইতেছেন। অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই নব্যসম্প্রদায়ের আত্মার ক্ষুধা মিটিবে না। আর কিছুতেই তাঁহাদের আত্মার 'পেট ভরিবে না'। আত্মার প্রকৃতিই এইরূপ যে, মহান পরমেশ্বর ব্যতীত ক্ষুদ্র পদার্থে চিরদিন তাহার তৃপ্তি হয় না। 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' পৌত্তলিকতারূপ বদ্ধ পুষ্করিণীর জলে চিরদিন কখনই আত্মার জ্ঞান ও প্রেমতৃষ্ণার শান্তি হয় না।

মানুষ পরিমিত। সে পরিমিতের মধ্যে বদ্ধ; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা অনন্তের দিকে ছুটিতেছে। দাঁড়াইতে কতটুকু স্থান চাই? এক হাত স্থানের মধ্যেই আমরা দাঁড়াইতে পারি। কিন্তু এক হস্ত পরিমিত স্থানে বদ্ধ থাকিয়া কে সন্তুষ্ট হইতে পারে? অসীম-প্রায় পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে। যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ছুটিয়া যাইবার স্বাধীনতা আমরা চাই। এক স্থানে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমরা চারিদিকে যতদূর দেখিতে পাই তাহার অবশ্য সীমা আছে। কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিয়া অসীম আকাশ রহিয়াছে এই বিশ্বাসেই আমাদের চিত্ত উন্নত হয়। আকাশ ও সমুদ্রে আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে আত্মার স্ফূর্তি ও আনন্দ তত হয় না, যাহা দেখিতে পাই না, যাহা আমাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহাতেই আত্মার স্ফূর্তি ও আনন্দ।

এস্থলে একটী বিশেষ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। সাকার-বাদিগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তোমরা নিরাকার উপাসক হইয়া পরমেশ্বরের চরণ, হস্ত, মুখ ইত্যাদি সাকারবোধক শব্দ ব্যবহার কর কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। মনুষ্য স্বভাবতঃ ভাবুক ও

কবি। হৃদয়ে ভাব ও কবিত্ব আসিলেই মনুষ্য স্বভাবতঃ রূপক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইচ্ছা না করিলেও স্বাভাবিক কল্পনা ও কবিত্ব উক্তরূপ রূপক শব্দসকল সৃষ্টি করে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাতে কিছুই দোষ নাই। প্রাচীন মহর্ষিগণ উপনিষদে পরমেশ্বরকে নিরবয়ব চিন্ময় বলিয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াও আবার বলিতেছেন ঃ

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

'সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু, সর্বত্র তাঁহার পদ।' রূপক শব্দ ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কখনই সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও প্রার্থনীয় নহে। রূপক শব্দ হৃদয়ের ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাবকে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। উহা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। লোকে পত্রের শিরোনামায় ভক্তিভাজন লোককে 'শ্রীচরণ-কমলেষু' লিখিয়া থাকে। উহার অর্থ এরূপ নহে যে পত্রখানি উক্ত ব্যক্তির চরণে গুঁজিয়া দিতে হইবে। মান্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় লোকে বলিয়া থাকে 'আপনার চরণে এই নিবেদন করিতেছি,' এ কথার অভিপ্রায় কি? কে এমন নির্বোধ আছে যে বলিবে যে, মুখের নিকট, নাকের নিকট, হাতের নিকট, উদরের নিকট নিবেদন না করিয়া মনুষ্য মান্য ব্যক্তির পদের নিকটই নিবেদন করে? কেন না বলিবে যে, উক্ত স্থলে 'চরণ' শব্দ কেবল বিনয় প্রকাশ করে মাত্র? বিশেষ বিশেষ স্থলে চরণ শব্দ আশ্রয়, বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করে।

জ্ঞান ও ভাব, এই উভয় সম্বন্ধেই সাকারবাদ অপেক্ষা, নিরাকার ব্রহ্মপূজা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। একটি পরিমিতের মধ্যে বদ্ধ; আর একটির গতি অনন্তের দিকে। পৌত্তলিকের দেবতা কাশী, বৃন্দাবন

প্রভৃতি তীর্থে বদ্ধ। ব্রাহ্মের দেবতা পৃথিবীর সকল গ্রামে, সকল নগরে, কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। পৌত্তলিকের দেবতা বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে অধিষ্ঠিত; ব্রাহ্মের দেবতা সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মমন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর কাশীতে আছেন, ইহা সত্য: কিন্তু তিনি যেমন কাশীতে আছেন, সেইরূপ মক্কাতেও আছেন; তেমনি সমভাবে নিখিল বিশ্বে, বিশ্বাশ্রয়রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত, কাশীর মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডে প্রকৃত বিশ্বেশ্বর স্থিতি করিতেছেন; সেইরূপ সমভাবে সকল প্রস্তরখণ্ডেই,—ঐ রাস্তার প্রস্তরখণ্ডসকলেও, তিনি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পৌত্তলিকের নিকট কাশীধাম পবিত্র তীর্থ; ব্রহ্মোপাসকের নিকট নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই পবিত্র তীর্থ; তাঁহার বিশ্বেশ্বর, নিখিল বিশ্বপূর্ণ করিয়া স্থিতি করিতেছেন।

কাশীতে যেবার প্রথম গমন করি, তথায় একটী অন্ধের গান শুনিলাম,—'বিশ্বেশ্বর হে, কেবল তুমি নও কাশীবাসী; সর্বত্র বিরাজ তুমি ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী' ইত্যাদি। কাশীতে বসিয়া অন্ধের মুখে এই সঙ্গীতটি শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। পৌত্তলিকতা ঈশ্বরকে দেশকালে বদ্ধ করে, তাঁহাকে দেশকালের অতীতরূপে দর্শন করাই ব্রহ্মজ্ঞান। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সঙ্কীর্ণ ও উদার, দেশকালে বদ্ধ ও দেশকালের অতীত, পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ গুরুতর প্রভেদ। বদ্ধ হইলেই পৌত্তলিকতা; অসীম, উন্মুক্ত, উদার হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান। 'অভ্রভেদী অচলশেখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথায়; রবিকিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি; তব কান্তি মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথায়।' ব্রহ্মোপাসক বিশ্বাসচক্ষে তাঁহাকে সর্বত্র দর্শন করেন;—সর্বত্র তাঁহার তীর্থ, সর্বত্র

তাঁহার দেবমন্দির। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জড়ে তিনি সৎরূপে প্রকাশিত, জীবে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত; এবং সাধু ভক্তের হৃদয়ে তিনি আনন্দরূপে প্রকাশিত। পরমেশ্বরের সর্বোত্তম প্রকাশ সাধু ভক্তে। জড়ে তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি, জড় তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। জড়ে তাঁহার সৎস্বরূপ প্রকাশিত। জীবসাধারণের মধ্যে তিনি উচ্চতর ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। জীবে তাঁহার সত্তা ও চৈতন্য; সৎ ও চৈতন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানী, সাধু, ভক্তের অন্তরে তিনি সৎরূপে, চৈতন্যরূপে ও আনন্দরূপে প্রকাশিত। এখানেই তিনি সচ্চিদানন্দরূপে দর্শন দিতেছেন। সর্ব্বত্র তাঁহার অধিষ্ঠান, কিন্তু সাধুভক্তের অন্তরে তাঁহার উচ্চতম প্রকাশ। জড়ে তাঁহার নিকৃষ্টতম প্রকাশ। যদি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পূজা করিতে চাও, সাধু ভক্তের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। অন্ধ হইয়া জড়মূর্তির নিকটে যাইতেছ কেন? তাঁহার প্রকাশের তারতম্য আছে; কিন্তু তিনি সর্বত্র অধিষ্ঠিত। কোথায় তাঁহার মন্দির নাই? 'সুবিশাল-মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।' শক্তিরূপে, প্রাণরূপে, সেই প্রাণের প্রাণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত।

সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ কি এতই বিপরীত যে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য অসম্ভব? সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই আছে। মূর্তিপূজার সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সামঞ্জস্যের কথা বলিতেছি না। মূর্তি মিথ্যা, কল্পনামাত্র। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" ইহাই ঋষিবাক্য। কিন্তু সাকার ও নিরাকার এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সুবিশাল বহির্জগতে এই সাকার পদার্থনিচয়ের মধ্যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে, সেই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ অধিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। ব্রহ্মশক্তি সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত। দিব্য চক্ষুধারী সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্বত্র সাকার

ও নিরাকার একীভূত দেখেন। নিরাকার ব্রহ্মশক্তি সাকার জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ। নিরাকার হইতেই সাকারের উৎপত্তি ও স্থিতি। ছিল ব্রহ্মশক্তি, হইল জগৎ। মূলে নিরাকার, প্রকাশে সাকার। প্রকৃত সাধকের নিকট সাকার নিরাকারের একত্ব প্রকাশ পায়। তাঁহার নিকটে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময় সাকার।

প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে পূজা করিতে চাই। তিনি অন্তরতম প্রিয়তম পুরুষ। অন্তরে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। পুত্তলিকা বাহিরের জিনিষ বাহিরে থাকুক। আমার ইষ্টদেবতা অন্তরে, তিনি অন্তরতম। পুত্তলিকা বাহিরে কত দূরে। প্রভু নিকটে রহিয়াছেন; প্রাণস্বরূপ প্রাণে রহিয়াছেন। বাহিরে জড়ের আশ্রয় লইতে যাইব কেন? যতদিন মনুষ্য মূর্তিপূজা করে, ততদিন সে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে। মনুষ্য যখন আপনার অন্তরে প্রবেশ করে, সেখানে চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ দেবতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়।

ব্রহ্মোপাসক তাঁহাকে অন্তরে সম্ভোগ করেন। কিন্তু অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার লীলা দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হন। তিনি সমদর্শী হইয়া যান। ব্রাহ্মণদেহ ও চণ্ডালদেহ, উভয়েরই উৎপত্তি, স্থিতি সেই পরম সত্তার মধ্যে। যখন তাঁহাকে দেখি, তখন আমাতে, তাঁহাতে ও জগতে, এক হইয়া যায়। সর্বত্র তিনি, সকলই তাঁহার লীলা।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, সাকারবাদীরা কি মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না? তাঁহারা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিবেন না? রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত

ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যার পর নাই উদারমত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। আমরা কখন এরূপ বলি না যে, নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী সকলেই নরকগামী হইবে। মুক্তি কাহারও একচেটিয়া নহে। কর্মানুসারে নিশ্চয়ই ফললাভ হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা, সেই পরিমাণেই তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি মলিনচরিত্র, অভক্ত ও স্বার্থপর হয়, সে নামে ব্রাহ্ম হইলেও প্রকৃত ধর্মের সহিত তাহার সম্পর্ক অতি অল্প; মুক্তির রাজ্য হইতে বহুদূরে। আর সাকার উপাসক হইয়াও যিনি সরল, সত্যানুরাগী, প্রেমিক, পরোপকারী, ভক্তিমান, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিরাজ্যের নিকটবর্তী। কিন্তু একটী কথা বিশেষ করিয়া বলি। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই, সত্য ভিন্নও মুক্তি নাই। অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে? মুক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, অপ্রেম, অপবিত্রতা ও অসত্য, এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে পৌত্তলিকতা লইয়া মনুষ্য কেমন করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে? পাপাসক্তির শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেইরূপ, সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার, ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলেও মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কি উপায়ে তাহা হইবে? সৎগুরু, সৎশাস্ত্র ও ব্রহ্ম-কৃপা, এ তিন উপায়।

সাকার উপাসনা বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। মূর্তিপূজার অসারত্ব ও নিরাকার ব্রহ্মপূজার আবশ্যকতা-প্রতিপাদক শ্লোক শাস্ত্রে রাশি রাশি রহিয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ,

তন্ত্র, সমগ্র শাস্ত্রেরই তাৎপর্য এই যে, মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্যের জন্য মূর্তিপূজা। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। তপোনিষ্ঠ মহর্ষি উপনিষদে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন: 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে; 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত', পরমাত্মাকেই প্রীতির সহিত উপাসনা করিবে।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্যৈব মহিমা ভুবি দিব্যে
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, যাঁহার এই মহিমা ভূলোকে ও দ্যুলোকে, যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ধীরেরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা সর্বত্র দৃষ্টি করেন।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্মণা বা
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগদ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে মনন শক্তি দিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকে জান, লোকে যে কোন পরিমিত পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

বেদের শিরোভূষণ উপনিষদে এই কথা উক্ত হইয়াছে।

একব্যাপীসমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্বগতোঽব্যয়ঃ॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরমাত্মা এক এবং সর্বব্যাপী, সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান; তিনি শুদ্ধ, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জন্ম নাই এবং বৃদ্ধি নাই, সেই বিভু সকল স্থানে অব্যয়ভাবে প্রকাশিত আছেন। একমাত্র আকাশ যেমন শ্বেত নীল বর্ণভেদে ভিন্নভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মা এক হইলেও ভ্রান্তদৃষ্টি মানবগণ তাঁহাকে পৃথক পৃথক রূপে দর্শন করিয়া থাকে।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

সকল প্রাণীতে বর্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

সে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা, প্রস্তর, তথা বর্ণ, ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত বিগ্রহে ঈশ্বরজ্ঞান করে, তাহারা যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, পরম সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

উপেক্ষ্য তৎ তীর্থযাত্রাং জপাদীনেব কুর্বতাম্।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ী-ভিন্যায় আপতেৎ ॥

পঞ্চদশী ধ্যানদীপ।

পরব্রহ্মের উপাসনাতে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রা, জপ, হোম করিয়া থাকে, তাহারা হস্তস্থিত খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ হস্তকেই লেহন করে।

কৃত্বা মূর্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং কুরু।
নির্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতে ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা, নবম প্রকরণ।

যিনি বৈরাগ্য ও সমতার যোগে সংসার হইতে নিস্তার করেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মে মূর্তি কল্পনা করিয়া কোনও কর্ম করিও না।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কি কার্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥

কুলার্ণব, নবম উল্লাস।

পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অন্য সকল নিয়মে কোন প্রয়োজন থাকে না; মলয়মারুত প্রাপ্ত হইলে তালবৃন্ত লইয়া কি কার্য?

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
নির্মলং নিষ্কলং নিত্যং নির্গুণং ব্যোমসন্নিভম্ ॥

কুলার্ণব, তৃতীয় উল্লাস।

হে কুলেশ্বরি! পরব্রহ্মকে ধ্যানদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি নির্মল, নিষ্কল, নিত্য, নির্গুণ, ব্যোমসন্নিভ।

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥
অরূপং রূপিনং কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ ॥

কুলার্ণব, ষষ্ঠ উল্লাস।

সাধারণের হিতের নিমিত্ত চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও শরীরবিহীন পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। রূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া মনুষ্যেরা কর্মকাণ্ডে রত হন, আর পুণ্যবান মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ অমৃত ও আনন্দপরায়ণ হইয়া থাকেন।

মনসা কল্পিতা মূর্তি নৃণাঞ্চেৎ মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥

মহানির্বাণতন্ত্র।

মনঃকল্পিত মূর্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে মনুষ্যেরা স্বপ্নলব্ধ রাজ্যদ্বারা অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতৎ তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভব সম্ভবঃ ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা, প্রথম প্রকরণ।

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্যজ্ঞান কর, এই পরমতত্ত্বের উপদেশ দ্বারা পুনর্বার সংসারে জন্ম হয় না।

পৌত্তলিকতার অসারত্ব এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে উক্তরূপ শ্লোক কত দেখাইব? উক্তরূপ শ্লোকে হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই ইহা অবগত আছেন।

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে, এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে কি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, শ্রবণ করুন :

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে। ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রকাশিত মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় এই কয়েকটী শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ আছে : 'হে অর্জুন! ত্রিবেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানপর, যজ্ঞশেষে সোমরসপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন।

অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্বক, অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রত ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূত-সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

গীতার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞ ও দেবার্চনাদ্বারা অস্থায়ী স্বর্গভোগ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না। দেবোপাসকেরা দেবলোকে গমন করেন, শ্রাদ্ধাদিপরায়ণ পিতৃব্রত ব্যক্তিগণ পিতৃলোকে গমন করেন, এবং ভূতের উপাসকেরা ভূতসকলকে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পরমাত্মার উপাসনাব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মদৃষ্টিতে অদ্বৈতভাবে উপদেশ দিতেছেন, অন্যান্য অনেক মহাত্মাও ঐরূপ করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির অবিদিত নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদায় সকলের মধ্যে যে মত-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কেবল বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে, এমন নহে, শাস্ত্রেও ঐ মত-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়সকলের অবলম্বিত শাস্ত্রসকল পরস্পরের প্রতি সুতীক্ষ্ণ

বাণ বর্ষণ করিতেছেন। পরস্পরের ধর্মমত ও উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য খর্ব করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ভগবতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের উদ্ভবকারিণী; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, বিষ্ণু হইতেই দেবগণের উৎপত্তি; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতার সৃষ্টিকর্তা মহাদেব; কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, ব্রহ্মা হইতে মহাদেবের উৎপত্তি। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, বিষ্ণুই আদি কারণ; তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ স্বীয় স্বীয় কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আবার কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে মহাদেবই আদি কারণ। তাঁহা দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন, মা কালীর কৃপায় বিষ্ণু পালনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন। কোন শাস্ত্র বিষ্ণুপূজা নিষেধ করিতেছেন, এবং কোন শাস্ত্র বিষ্ণু ভিন্ন অন্য সকল দেবতার পূজাই নিষেধ করিতেছেন। কোন শাস্ত্র বলিতেছেন যে, যাহাতে ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাই ভাগবত : সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র ভাগবত, ধূর্ত দুরাত্মাদিগের কল্পনামাত্র। পূর্বে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। এস্থলে আরও কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে :

সর্বমন্ত্রময়ী ত্বং হি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বৎসমুদ্ভবাঃ।
চতুর্বর্গাত্মিকা ত্বং বৈ চতুর্বর্গফলোদয়া ॥ কাশীখণ্ড।

তুমি সর্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভাবকারিণী, চতুর্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্বর্গফল-দায়িকা।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, মধুকৈটভবধ প্রকরণ।
৮৪ শ্লোক।)

তুমি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার), বিষ্ণু ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন করিয়াছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে?

বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মণ্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ।
নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
* * * * * *
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ।
ভাগবত ২।৫।১৪, ১৫ ও ১৭ ॥

ব্রহ্মণ্! বাসুদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই। নারায়ণ হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগণ নারায়ণের অঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করেন * * *

তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সৃষ্টিকর্তা। আমি তাঁহার কটাক্ষপাতমাত্র আদেশ পাইয়া তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু সমুদয় পুনরায় সৃষ্টি করিতেছি।

অশক্তোঽহংগুণান্ বক্তুং মহাদেবস্য ধীমতঃ।
যো হি সর্বগতো দেবো ন চ সর্বত্র দৃশ্যতে ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা চ প্রভুরেব চ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যং হি দেবা উপাসতে ॥
প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভি ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ১৪।৩-৫

যিনি সর্বত্রব্যাপী, অথচ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর নন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবরাজের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু এবং ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্যন্ত দেবতাগণ যাঁহার উপাসনা করেন আমি সেই ধীমান মহাদেবের গুণবর্ণনে অশক্ত।

ব্রহ্মা তস্যোদরভবস্তথাচাহং শিরোভবঃ ॥

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ১৪৭।৪

ব্রহ্মা কৃষ্ণের উদর হইতে উৎপন্ন হন এবং আমি (অর্থাৎ মহাদেব) তাঁহার শিরোদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করি।

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।১০

তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মার) ক্রোধানলে প্রদীপ্ত ভ্রুকুটিকুটিল ললাটদেশ হইতে মধ্যাহ্নকালের সূর্যপ্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রুদ্র উৎপন্ন হইলেন।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

ভাগবত ২।৬।৩০

"আমি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) তাঁহা (অর্থাৎ বিষ্ণু) কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন করিতেছি এবং মহাদেব তাঁহার আদেশক্রমে সংহার করিতেছেন।

অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতঃ মাং মহাদেবং ভয়ং সর্বং বিমুঞ্চতম্ ॥
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রাভ্যাং মম পূর্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥
বামে পার্শ্বে চ মে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ।

লিঙ্গপুরাণ ১।১৯।১-৩

পরে মহাদেব বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠ! (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) আমি (নারায়ণের স্তবে) সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব; আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। পূর্বকালে তোমরা দুই মহাবল [পুরুষ]

আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগতের আত্মাস্বরূপ হৃদয়োদ্ভব বিষ্ণু আমার বাম পার্শ্বে প্রসূত হন।

বৎস! বৎস! হরে, বিষ্ণো, পালয়ৈতচ্চরাচরম্।

লিঙ্গপুরাণ ১।১৯।১১

বৎস! বৎস! হরি! বিষ্ণু! তুমি এই চরাচর জগৎ পালন কর!

বয়সে ও সম্পর্কে ছোট হইলে যেমন ভাবে লোকে কথা বলিয়া থাকে, এস্থলে মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি সেইরূপ বাৎসল্যভাবে কথা বলিতেছেন।

বেদাবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিনা।
হরের্নাম ন গৃহ্ণীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীদলম্ ॥
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চয়েৎ।

কুলাবতী তন্ত্র

বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না, ও শালগ্রাম পূজা করিবে না।

গোলোকাধিপতির্দেবীস্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ ॥

নির্বাণ তন্ত্র

কালিকার স্তুতিভক্তিপরায়ণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ কালীপদ প্রসাদে লোকের পালন-কর্তা হন।

যেঽন্য দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥

রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফটিকাক্ষাদিধারিণঃ।
জটিলা ভস্মলিপ্তাঙ্গাস্তেবৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে॥

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৪ অধ্যায়।

যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎপূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতংতদ্বৈ ভাগবতং বিদু ঃ॥
কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানো ধূর্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ। স্কন্দপুরাণ

যে গ্রন্থে অনেকানেক অসুরবধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত দুরাত্মা লোকসকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবত কল্পনা করিবে।

তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমতি বিপ্রাণাং চণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥
তস্য সর্বানি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০৩ অধ্যায়।

বিষ্ণু ভিন্ন অন্যদেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত। তাহা করিলে দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়, তাহার সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার পিতা নরকে গমন করেন।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকো বিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনম্॥

কূর্মপুরাণ, ২৫ অধ্যায়।

যাঁহারা শিব নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিধিসমুহ শীঘ্র নষ্ট হয়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদের্ভূরিমানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবো বারি হস্তেহন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ।
ন কার্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১০০

"সৌর, গাণপত্য, শাক্ত শৈবাদির হস্তে বৈষ্ণব অন্ন জল গ্রহণ করিবে না। বিষ্ণুভক্ত শৈবশাক্তাদির সংসর্গ করিবে না, ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনাও করিবে না। তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষতুল্য।

মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষাংস্তু দেবানাং নির্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥
সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
নির্মাল্যং শঙ্করাদীনাং সশ্চণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবং॥
কল্পকোটীসহস্রাণি পচতে নরকাগ্নিনা॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৮ অধ্যায়

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্মাল্য গর্হিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্রও শিবাদির প্রাসাদ সামগ্রী ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। সে নরকাগ্নিতে কোটী সহস্র কল্প দগ্ধ হয়।*

একজন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'পুরাণ সকল পরস্পর কবির লড়াই!' একই পরমেশ্বর বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ হইয়াছেন,

* ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় ভাগ, পুরাণবিবরণ দেখ।

—যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব, তিনিই দুর্গা, ইহা আজ কাল অনেকে উদারতা রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই মত শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। পুরাণসকল পাঠ করিলে ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, নিজ নিজ উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্যবর্ধন এবং অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার গৌরব খর্ব করিবার জন্য বিবিধ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। এক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, এই মত কিছুতেই রক্ষা পায় না। বহুদিন হইল, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে এই মত উড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' গ্রন্থে এ বিষয়ে এইরূপ বলিতেছেন,—'পুরাণের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেদব্যাসকে প্রচলিত পুরাণসকলের রচয়িতা বলিয়া কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না ; প্রত্যুতঃ স্বধর্মানুরক্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্ব স্ব মতানুযায়ী স্বধর্মপ্রণালী প্রচলন উদ্দেশে, তাঁহার নামে সেই সমস্ত প্রচার করা হইয়াছে, এইটীই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আর একরূপ প্রমাণেও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধমত, ঘোরতর নিন্দাবাদ ও বিষময় বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে যে, সে সমুদায় এক মতাবলম্বী একব্যক্তি কর্তৃক বিরচিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়।' অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা নিরূপণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথাটা আনুষঙ্গিকরূপে আসিয়া পড়িল। যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার একত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মত উদার ও অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত হইলেও উহা যে পুরাণশাস্ত্রসম্মত নহে, ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, পুরাণ সকল মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি,

ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবতানিন্দা এবং উপাসনা সম্বন্ধে ঘোরতর মত-বিরোধের বিষয় অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবদুক্তিরূপে রহিয়াছে :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

'যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই প্রকারে অনুগ্রহ করি।' এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া অনেকে বলেন যে ব্যক্তি সাকারভাবে পরমেশ্বরের ভজনা করে, পরমেশ্বর তাহাকে সাকাররূপেই কৃতার্থ করেন। যাঁহারা এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সাকারবাদ সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা নিরাকার উপাসককে আক্রমণ করেন কেন, বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি যেরূপে তাঁহার ভজনা করিতেছে, পরমেশ্বর যদি তাহাকে সেইরূপেই কৃতার্থ করেন, তাহা হইলে যিনি নিরাকার ভাবে তাঁহার ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকটে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশ হইবেন না কেন? শ্লোকটীর ঐ প্রকার অর্থ করিলে উহাদ্বারা সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ উভয়ই সমর্থিত হয়। কিন্তু বাস্তবিকউহা শ্লোকের প্রকৃত অর্থ নহে। সকাম, নিষ্কাম, এই উভয়ভাবে ভজনার কথা শ্লোকে বলা হইতেছে।*

আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সাকার ও নিরাকার, এই উভয় প্রকার পদার্থ রহিয়াছে। জড় বস্তু বা জ্ঞানবস্তু ভিন্ন লক্ষণদ্বারা আমাদিগের নিকট পরিচিত হইতেছে। আগে নিরাকার, পরে সাকার। জ্ঞান নিরাকার। জ্ঞান আপনাকে আপনি জানে। আমরা জ্ঞানদ্বারা জড় বা সাকার পদার্থকে জানি ; সুতরাং নিরাকার দ্বারা সাকার আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সাকারবাদীদিগের বিশ্বাস

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ দেখ।

এই যে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠান হয়। আবার পূজা হইয়া গেলে দেবতা প্রতিমা হইতে চলিয়া যান। দেবতা প্রতিমাতে আসেন, কিয়ৎকাল থাকেন, পরে চলিয়া যান। দেবতার আবির্ভাব, অধিষ্ঠান, ও তিরোভাব কেহ স্বচক্ষে দেখিতে পান না, বিশ্বাস করেন। যদি বিশ্বাসের উপর দেবদেবীর পূজা নির্ভর করে, তবে নিরাকার উপাসকের প্রতি আক্রমণ কেন? তোমারও বিশ্বাস, আমারও বিশ্বাস। উভয় স্থলেই বিশ্বাস। উভয়েরই অবলম্বন রহিয়াছে। উভয়স্থলে বিশ্বাস বলিয়াই কি নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাসনা তুল্য হইল? কখনই না। একটী কল্পনা ও কুসংস্কার, আর একটী সত্য। সাকারবাদী কাষ্ঠাদিনির্মিত প্রতিমার কল্পিত আবির্ভাব ও তিরোভাব বিশ্বাস করেন। ব্রহ্মোপাসক সর্বভূতে, জলস্থলশূন্যে সেই সত্যস্বরূপ প্রাণস্বরূপ পরম দেবতার সত্তা জ্ঞান চক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। এই উভয় কি সমান হইতে পারে? মনুষ্যের জড়দেহে জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। জড়দেহ চর্মচক্ষে দেখিতে পাই; কিন্তু যে জ্ঞানবস্তুর সত্তা তাহাতে রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না। চর্মচক্ষে দেখিতে পাই না, জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাই। মৃত দেহকে চর্মচক্ষে দেখি, তাহাতে আর কিছু দেখি না।

জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জীবিত মনুষ্যে মনও আত্মা দেখি। সেইরূপ ব্রহ্মোপাসক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। কুম্ভকার-নির্মিত পুত্তলিকা দেখিলে তাহার কর্তা কুম্ভকারকেই স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক; জগৎ দেখিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। কারণকে কার্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পুত্তলিকা ও কুম্ভকার, জগৎ এবং জগদীশ্বর, এ উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ। কোন ব্যক্তির ছবি দেখিলে তাহাকে স্মরণ হয় সত্য; কিন্তু সেই অনন্ত পরাৎপর পুরুষের ছবি

কোথায়? কোন শিল্পী অনন্তের ছবি চিত্রিত করিতে পারে? মূর্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং অনন্তের মূর্তি অসম্ভব কথা। তিনি সর্বশক্তিমান; সুতরাং তিনি মূর্তিপরিগ্রহ করিতে পারেন, ইহা একান্ত অযুক্ত কথা। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্যে তিনি সর্বশক্তিমান। কিন্তু আত্মস্বরূপ বিনাশে তাঁহার ক্ষমতা আছে, এমন কথা বলিলে নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। তিনি বিশ্বরূপ, সকলেই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; সুতরাং জ্ঞানিগণ একভাবে বলিয়াছেন যে, এই বিশ্ব তাঁহার রূপ প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু আবার ইহাও বলিয়াছেন, এ সকলের কিছুই তিনি নহেন। জগৎ অসত্য, অনিত্য। তিনি সত্য, নিত্য। জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল; তিনি সকল পরিবর্তনের অতীত। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত, অথচ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ। সাকার চিন্তা করিতে করিতে নিরাকার উপাসনার অভ্যাস জন্মে এবং অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে আলোক দেখিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, এ উভয়ই সমান কথা। যে সকল বিষয় পরস্পরবিপরীত, তাহাদের মধ্যে একটি অভ্যাস করিলে অপরটিকে জানিবার ও আয়ত্ত করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, ইহাই অভ্যাসের নিয়ম। প্রচলিত পৌত্তলিকতা ব্রহ্মোপাসনার নামান্তর মাত্র, এ কথা সত্য নয়। প্রতিমাতে অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া পৌত্তলিক উহার পূজা করেন, ইহা অমূলক বাক্য। স্বভাবতঃ ভৌতিক পূজা ও প্রতিমা পূজার উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দেব দেবীর মূর্তি রূপক কল্পনামাত্র; রূপক ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার উপকার আছে।

অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব; সুতরাং পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। অনন্তকে আমরা জানি,

অথচ জানি না। মনুষ্য অনন্তের পূজায় সমর্থ। পুত্তলিকাকে পরমেশ্বরের পূজার চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিলে, চিহ্নই ক্রমে আসল বস্তুর স্থান অধিকার করে। নিরাকার পরমেশ্বর সম্বন্ধে মুখ, চরণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কোন দোষ নাই। পৌত্তলিকতা দ্বারা মানবাত্মার জ্ঞান ও ভাব, এই উভয়ের কিছুরই পূর্ণ তৃপ্তি হয় না।

মূর্তিপূজা কল্পনামাত্র। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে নিরাকার পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পূজা কর। সাকার বিশ্বসৃষ্টি অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সাধকেরা ইহা করিয়া থাকেন। এস্থলেই সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য।

প্রিয়তমকে প্রাণের ভিতর রাখিতে ইচ্ছা হয়। পুত্তলিকা বাহিরের বস্তু। চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর প্রাণের ভিতরে। সেখানেই তাঁহার প্রকৃত পূজা। সাধকের উচ্চ অবস্থায় অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। তখন সকলই পরমেশ্বরের প্রকাশ।

পরিত্রাণ কাহারও একচেটিয়া নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে জীব মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসকল নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা শত কণ্ঠে উপদেশ দান করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, ইহা প্রাচীন মহর্ষিগণের সুস্পষ্ট উপদেশ। আমরা সেই মহর্ষিগণের উপদেশ না বুঝিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পরিত্রাণের পথ ছাড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছি। ভারতে আবার সুদিন আসুক। ঋষিদের, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের জয়-পতাকা ভারতবাসীর গৃহে গৃহে উড্ডীন হউক। কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বিদূরিত হউক। হে সত্য পুরুষ, ভারতবাসীর হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, পবিত্র ব্রহ্মনাম ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত ধ্বনিত ইতে থাকুক!

—